লিখন

Stockholm Sarbojonin Puja Committee LIKHON 2024

শারদীয়া সংখ্যা

দ্বাদশ বর্ষ ১৪৩১

স্টকহোল্ম সার্বজনীন পূজা কমিটি

স্টকহোল্ম সার্বজনীন পূজা কমিটি

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা নির্ঘন্ট বঙ্গাব্দ ১৪৩১

এই বছর দেবী দুর্গার আগমন দোলায়, যার ফল মড়ক এবং গমন ঘোটকে, যার ফল ছত্রভঙ্গ। ফলে এটি অশুভ ইঙ্গিত।

Stockholm sarbojonin puja committee (SSPC)

Sree Sree Durgapuja Nirghonto 2024

অধিবাস, বোধন ও ষষ্ঠী **২৪ আশ্বিন, ইং** 11th October Friday, **শুক্রবার**	17:30 :Puja (Adhibas,Bodhon o Shosthi) 18:30 : Cultural Program 19:30 : Bhog Prasad
সপ্তমী ও মহাঅষ্টমী **২৫ আশ্বিন, ইং** 12th October Saturday, **শনিবার**	11:00 : Puja 13:00 : Pushpanjali 13:30 : Bhog Prasad 16:00 : Cultural Program 17:30 : Sandhi puja 18:30 : Cultural Program 20:00 : Prasad Bhog
নবমী ও বিজয়া দশমী **২৫ আশ্বিন, ইং** 13th October Sunday, **রবিবার**	11:00 : Puja 12:30 : Pushpanjali 13:00 : Bisorjon 13:30 : Bhog Prasad 15:00 : Cultural Program 17:00 : Sindoor khela

SSPC ১২

12 years of festivities for all

সূচীপত্র Content

প্রবন্ধ

পৃ - ২ বাংলাদেশ দূতাবাসের বাণী

পৃ - ৩ Message from Ambassador of India

পৃ - ৪ নারী-শক্তি-প্রকৃতি --- *বিষ্ণু চক্রবর্তী*

পৃ - ৭ মায়ের অকালবোধন --- *প্রিয়রঞ্জন ভকত*

পৃ - ১২ শৈশবের ক্যান্সার: সুইডেনের স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও গবেষণার সাফল্য --- *ইন্দ্রনীল সিনহা*

পৃ - ১৯ Fasting- a practical eye opener --- *Dr. Abhishek Chowdhury*

পৃ - ২২ মেরুদন্ড --- *ডঃ যশস্বী চক্রবর্তী*

পৃ - ২৬ ওরা - ও কিন্তু আমরা – ই --- *ডঃ আশিস্‌ কুমার সিংহ*

পৃ - ৩৪ ব্যালকনি --- *সুচরিতা সেন চৌধুরী*

পৃ - ৩৭ দুটো দিন ও দু'শো টাকা --- *উজ্জ্বল*

পৃ - ৪৪ বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির 'মিথ' ও 'রূঢ় বাস্তবতা' --- *গোপাল বাগচী*

কবিতা

পৃ - ১০ The Bells of the Past --- *Avinanda Ray*

পৃ - ১৪ তিলোত্তমা --- *অয়ন চক্রবর্তী*

পৃ - ১৫ An Autumn's Prelude --- *Sayani Pathak*

পৃ - ১৭ পূর্ব নির্ধারিত --- *মৌমিতা ঘোষ*

পৃ - ২১ বিচার চাই --- *ডঃ (শ্রীমতি) গোপা মুখার্জী*

পৃ - ২১ মহামানবের অপেক্ষায় --- *শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়*

প্রণালী

পৃ - ৩২ রুই মাছের মুড়োর মুড়িঘন্ঠ --- *স্বর্ণা সিনহা*

পৃ - ৩৩ চিলি চিকেন --- *দীপান্বিতা দে*

পৃ - ৩৪ বিটের চাটনি --- *স্বর্ণা সিনহা*

Front Cover By

Anwesha Biswas

Likhon designed By

Sayan Dutta

LIKHON is a yearly puja magazine of Stockholm Sarbojonin Puja Committee (SSPC), Sweden. It is distributed free by SSPC. The writing and artwork herein were produced for SSPC LIKHON. The opinions rendered in the articles are entirely the thoughts and views of the respective authors only and not that of SSPC. No copyright infringement is intended in Likhon.

সম্পাদকীয়

বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণের কেন্দ্রবিন্দুতে দুর্গাপুজোর অবস্থান বহুদিনের। বছরের কয়েক দিন সকলকে নিয়ে একসাথে বেঁধে রাখার উদযাপন হলো আমাদের এই দুর্গোৎসব ।

আশ্বিনের শারদপ্রাতে যে আলোক-মঞ্জীর বীরেন্দ্রকৃষ্ণের ভদ্রের কণ্ঠে অনুরণিত হয়ে ওঠে, অমনি শুরু হয়ে যায় পুজোর রেশ।

আর সেই রেশ ছড়িয়ে পড়ে দেশে বিদেশে। দুর্গাপূজা এবং মা দুর্গার আরাধনায় আমরা মেতে উঠি এই সময়।

মা দুর্গাকে আরাধনা বা সম্মান জানানো কিন্তু পুজোর চার দিনের বা চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, সেই আরাধনার সর্বজনীন ভাবটাও কিন্তু আমাদের সনাতন ভারতের চিরন্তন রীতি-নীতি।

কারণ মা দুর্গা আমাদের মধ্যেই আছেন, আমাদের মা, বোন, দিদি, মেয়ে, অর্ধাঙ্গিনী, দিদিমণি, ডাক্তার হয়ে। মা দুর্গার দশভুজা রূপ আমাদের সমাজে সংসারে সর্বত্র বিরাজমান ।

দুঃখের বিষয়, আমাদের সেই চেতনা থেকে আমরা অনেক দূরে সরে যাচ্ছি। এই মুহূর্তে আমাদের তিলোত্তমায় দুর্গার আরেক রূপ 'অভয়া' নিপীড়িত, নির্যাতিত, তাতে আমাদের এই পুজোর রেশ অনেকটাই মলিন হয়ে গেছে।

অভয়ার ঘটনার রেশে মা দুর্গা নিশ্চয় কৈলাশ থেকে মর্ত্যে আসার ব্যাপারে চিন্তিত আছেন।

কিন্তু যে ভাবে অভয়ার বিচারের অপেক্ষায় আন্দোলনমুখরিত, তাতে মা নিশ্চয় কিছুটা ভরসা ফিরে পেয়েছেন। আমরা সবাই রুখে দাঁড়াবার চেষ্টা করছি এই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে।

আমরা, আপনারা, দেশে-বিদেশে প্রচুর আন্দোলনে সামিল হচ্ছি, এবং সকলে মিলে এ যুদ্ধে সামিল হওয়ার আওয়াজ পৌঁছে দিচ্ছি।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, মা নিশ্চয় এই অসুরিক শক্তিকে আর বাড়তে দেবেন না। মহিষাসুরমর্দিনী রূপে মা অবতীর্ণ হয়ে দমন করবেন এই অসুরিক শক্তি।

আমাদের লিখনের তরফ থেকেই রইলো একটি অঙ্গীকার, রইলো নতুন দিগন্তের আশা, যেখানে সব মা দুর্গারা নিশ্চিন্তে স্বাধীনভাবে সমাজের সবকিছু সামলাতে পারেন।

লিখনের পক্ষ থেকে রইলো আপনাদের সবার জন্য শুভেচ্ছা, ভালোবাসা আর রইলো মায়ের কাছে প্রার্থনা।

'বাতাসে যারা মিশিয়েছে বিষ, মানবতা যারা শেষ করে, তোমার অস্ত্রে ছরাক আগুন, ধ্বংস করো তারে।'

শুভেচ্ছাসহ

জয়দীপ ব্যানার্জি
অয়ন চক্রবর্তী

সম্পাদকমণ্ডলী

Ambassador

EMBASSY OF
THE PEOPLE'S REPUBLIC OF
BANGLADESH
ANDERSTORPSVAGEN 12 (1 TR.)
SE-171 54 SOLNA, SWEDEN
TEL: +46 8 730 58 50 -52
FAX: +46 8 730 58 70

নং-১৯.০১.৪৬০১.৫০৫.৯৮.৯১৮.২১-৪৪২ তারিখঃ০৮ অক্টোবর ২০২৪

বাণী

বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের সর্ববৃহৎ ও প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা। হিন্দু সম্প্রদায় প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিপুল উৎসাহ ও উৎসবের মধ্য দিয়ে দুর্গাপূজা উদযাপন করে আসছে। কাল পরিক্রমায় দুর্গাপূজা শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের উৎসবই নয়, বরং এটি সার্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে। এ দুর্গাপূজার সাথে মিশে আছে বাংলার চিরায়ত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি।

সম্প্রীতির অমোঘ বার্তা নিয়ে পুরো দেশজুড়ে শারদীয় দুর্গাপূজার আগমন ঘটে। সমাজের সকল অন্যায়, অবিচার ও অসুরশক্তি দমন এবং চিরায়ত শান্তিপ্রতিষ্ঠার মহান লক্ষ্যে শারদীয় দুর্গাপূজা পালন করা হয়ে থাকে। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও দেশে ও প্রবাসে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা ও যথাযথ ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে দুর্গাপূজা উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

সকল ধর্মের শাশ্বত বাণী হচ্ছে মানবতা। ধর্ম মানুষকে মানবতার পথ দেখায়, অন্যায় থেকে দূরে রাখে এবং সত্য ও কল্যাণের পথে আহ্বান করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকলের সমানাধিকার নিশ্চিত করেছে।

সার্বজনীন এ পূজা বিদেশে আয়োজন প্রবাসীদের জন্য নিঃসন্দেহে অনেক কষ্টসাধ্য। প্রতিবারের ন্যায় এবারও দুর্গাপূজা আয়োজন করায় আয়োজকদের এ প্রশংসনীয় উদ্যোগকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। শারদীয় দুর্গাপূজায় ঐক্য, সৌহার্দ্য, ন্যায় ও সম্প্রীতির শক্তিকে ধারণ করে অসাম্প্রদায়িক সমাজ বিনির্মাণে সম্মিলিত ভাবে কাজ করবো- এ হোক আমাদের দৃঢ় প্রত্যয়।

সুইডেন, নরওয়ে এবং ফিনল্যান্ড- এ বসবাসরত সকল বাঙালি ভাই-বোনদের প্রতি রইলো আমার শারদীয় দুর্গোৎসবের আন্তরিক শুভেচ্ছা।

মেহ্দী হাসান
রাষ্ট্রদূত

सत्यमेव जयते

Embassy of India
Stockholm

Message
from
Chargé d'affaires, Embassy of India to Sweden & Latvia

Warm greetings on the auspicious occasion of Durga Puja.

The grand celebration of this significant Indian festival in Stockholm reflects the enduring cultural bonds between our two nations. Durga Puja, a profound homage to Matri Shakti, honors the divine arrival of Maa Durga and pays reverence to our ancestors, representing a tradition deeply embedded in our civilizational heritage.

In today's global landscape, the Indian philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam—meaning "the world is one family"—serves as a guiding principle. This philosophy encourages us to embrace diversity and foster unity among all cultures, transcending geographical boundaries.

I extend my heartfelt congratulations and sincere appreciation to the Stockholm Sarbojonin Puja Committee (SSPC) for their commendable efforts in celebrating Indian culture, preserving the spirit, and keeping the vibrancy of this beautiful festival alive.

My best wishes to everyone on this joyous occasion.

Rakesh Tiwari

প্রবন্ধ

নারী - শক্তি - প্রকৃতি

বিষ্ণু চক্রবর্তী

এবারের আমাদের মা মহামায়ার আগমনটা একটু অন্যরকম। একদিকে শক্তিরূপিণী মা মহামায়ার আগমনীর প্রস্তুতি অন্যদিকে মর্তে থাকা মহামায়া নারী শক্তিদের সুরক্ষার জন্য সাড়া ভারতবর্ষ উত্তাল। স্টকহলম সার্ব্বজনীন পূজাকমিটি প্রতিবৎসর পূজা মেগাজিন লিখন বের করে, আমিও প্রতিবছরই কিছু লিখি। যেহেতু আমি পুরোহিতের দায়িত্বে আছি সেহেতু আমি পূজা পার্বণ নিয়ে লিখতে পছন্দ করি, চেষ্টা করি ধর্মীয় বিষয়ে কিছু লিখার। আমাদের সনাতন হিন্দু ধর্মে পাঁচ জন শক্তির (মা দূর্গা, কালী, সরস্বতী, শ্রীমতি রাধিকা ও কমলা) মধ্যে আমরা প্রতি বছর তিন জনের (দূর্গা, কালী ও সরস্বতী) পূজার আয়োজন করে থাকি। সনাতন হিন্দু সমাজ প্রতিদিনই এই শক্তিরূপিণী নারীদের পুজো করে চলছে। ভারত বর্ষের বাংলাতে সবচেয়ে বেশি শক্তি উপাসনা হয় এরপরও যখন দেখি এই নারী নিরাপত্তা, অবমাননা, অসম্মান ও পরিচিতির অভাব তখনই প্রশ্ন জাগে আমরা কি আসলেই মনে প্রাণে এই শক্তি রূপিণী রমনীদের আরাধনা করি না নিতান্তই ধর্মীয় কারণে উৎসবের আনন্দ ভোগ করার জন্য ? সামাজিক পরিচয়ে একজন নারীর পরিচয় হল, তিনি কারো মেয়ে, কারো স্ত্রী, কারো মা। ঠিকানাতেও বাবারবাড়ী কিংবা শ্বশুরবাড়ি তাহলে তাঁর নিজের ঠিকানা কি ? এতোগেলো সামাজিক পরিবেষ্টিতে, ধর্মীয় রীতিতেও দেখি স্ত্রীদের জন্য কত বাঁধা। কিছু মন্দিরে নারীদের প্রবেশ অধিকার নাই, কিছুমন্ত্র নারীরা উচ্চারণ করতে পারবেনা। পিতা মাতার শ্রাদ্ধে নারীদের পিন্ড দানের অধিকার নাই, বাড়িতে পূজা পার্বনে গৃহ কর্তার নামে পুজোর সংকল্প করতে হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রশ্ন হল এগুলির প্রবর্তক কে ? বেদ পুরাণে কিন্তু এরকম লিখছে না। আজ আমি বেদ পুরাণ থেকে নারীদের নিয়ে যা লিখেছে সেটা নিয়ে লিখছি।

এই বিশ্বব্রহ্মান্ডের সব কিছুরই সৃষ্টি কর্তা প্রজাপতি ব্রহ্মা। ভগবৎ পুরাণ বিশ্লেষণে জানা যায় ব্রহ্মা যখন প্রারম্ভিক সৃষ্টি কার্যে নিমগ্ন ছিলেন,সে সময় তিনি খুবই দ্রুত সব কিছু রচনা করে যাচ্ছিলেন এ বিশ্ব সংসার ও তার উপাদান সমূহ। কিন্তু হঠাৎ তিনি এমন এক সৃষ্টি কার্য শুরু করলেন যা শেষ করতে প্রায় ছয় দিন সময় লেগে গেল। উপস্থিত দেবদূতেরা এহেন কার্যকলাপে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে প্রশ্ন করলেন।

``হে ভগবান, যে আপনি নিমিষের মধ্যে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রচনা করলেন, সেই আপনি কি এমন গড়ছেন যাতে আপনার এত সময় লাগছে ?´´

অল্প হেসে ব্রহ্মা উত্তর দিলেনঃ

´´হে দেবদূত, আপনারা আমার এই সৃষ্টিকে দেখতে পাচ্ছেন ?এর নাম নারী। এটি আমার সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। আমি একে অসীম ধৈর্য, সাহস, ক্ষমতা ও রূপ দিয়ে সৃষ্টি করেছি। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ্য ব্যাপার হল এই নারীই আমার সৃষ্টির ধারাবাহিকতা রক্ষা করবে। যে কোন পরিস্থিতিতে নিজেকে শান্ত রেখে প্রলয় কাল পর্যন্ত এর কাঁধে অর্পিত সমস্ত দায়িত্ব হাসিমুখে পালন করে যাবে। এই নারী তাঁর সর্বান্তকরণ দিয়ে পরিবারের প্রতিটি মানুষকে স্নেহের বাঁধনে বেঁধে রাখতে সক্ষম। অসুস্থ বা অন্য যে কোন পরিস্থিতেতে এর কাজ করার সক্ষমতা থাকবে সমান গতিতে। ``

বিস্মিত দেবদূত এবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন নারী নামক ব্রহ্মার সেই নব সৃষ্টির প্রতি। এবার তার বিস্ময় আরও বেড়ে গেল। দুটো চোখ, দুটো কান,দুটো হাত, দুটো পা আর উন্নত বক্ষযুগল নিয়েই গঠিত হয়েছে ব্রহ্মার এই রহস্যময়ী। কিন্তু এতে এমন কি আছে যার মধ্যে ভগবান এত গুনের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন ? প্রশ্ন করলেনঃ।

``হে ভগবান ব্রহ্মা, এর মাত্র দুটো হাত দিয়ে এত বহুবিধ কার্য সম্পাদন করা কিভাবে সম্ভব ?``

ব্রহ্মা বললেন , ``এর দুটো হাতে আমি অসীম শক্তি প্রদান করেছি। কোনো দশভুজা দেবীর তুলনায় এর এই দুই বাহু কোন অংশে কম নয়। সন্তান প্রতিপালন থেকে শুরু করে যাবতীয় গৃহকর্ম সেরেও এই নারী পুরুষদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে সক্ষম। ``

কৌতুহলি দেবদূত সেই নব সৃষ্টি নারীমূর্তিকে স্পর্শ করলেন এবং তার কৌতূহলের সীমানা অতিক্রম করলো। বললেন ,

``প্রভূ এ তো অনেক কোমল। এত নমনীয় শরীর কিভাবে এত কিছুর ভার বইতে সক্ষম হবে ?``

ব্রহ্মা বললেন , ``হে দেবদূত, আপনি শুধুমাত্র এর বাহিরটাই পর্যবেক্ষণ করলেন । প্রকৃত শক্তি কোন সৃষ্টির বাহিরে বা শরীরে অবস্থান করে না, অবস্থান করে তার অন্তরে। আমিও নারীর অন্তরে সেই অসীম শক্তির বীজ বোপন করে দিয়েছি যা দিয়ে সে সমস্ত মর্তলোকে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। তাই বাহিরে সে যত বেশী কোমল, অন্তরে সে ততবেশী মজবুতও। অর্থাৎ এ নারী কোমল হলেও দুর্বল নয়। ``

অন্তরে শক্তির প্রসঙ্গে দেবদূত ভগবানকে জিজ্ঞাসা করলেন, ``হে প্রভু , এ যদি এতটাই মজবুত হয়ে থাকে, তাহলে কি এর চিন্তা ভাবনা বা বিচার বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা আছে কি?``

ভগবান ব্রহ্মা বললেন, ``এর শুধু চিন্তা করার ক্ষমতা আছে এমন নয়। এই নারী যুক্তি দিয়ে কঠিনতম সমস্যার সমাধান করতেও সক্ষম। এ জানে কিভাবে এবং কোন পরিস্থিতিতে কোমল থাকতে হয় আবার কখন রুদ্রমূর্তি ধারণ করে সবকিছু বিনাশের কারণ হতে হয়। ``

দেবদূত দেখলেন যে, নারী মূর্তির চোখ থেকে শরীরে তরল কিছু প্রবাহিত হচ্ছে। এটাকে জল ভেবে দেবদূত জিজ্ঞাসা করলেনঃ , ``প্রভু এর শরীর বেয়ে জল কেন প্রবাহিত হচ্ছে?``

ব্রহ্মা জানালেন , `` এটি জল নয় এই হলো নারীর অশ্রু। ``

দেবদূত ভাবতে লাগলেন, এ হেন্ বিশাল ক্ষমতাসম্পন্ন নারীর অশ্রুর প্রয়োজন হল কেন?

ব্রহ্মা বললেন , `` এই অশ্রু হচ্ছে তার কষ্ট, তার সন্দেহ , তার একাকীত্ব , তার যন্ত্রনা এবং তার গৌরব প্রকাশের উপায়। আমি তাকে এমন শক্তি দিয়েছি যে শক্তির দ্বারা সে তার সমস্ত কষ্ট , দুঃখ ও যন্ত্রণাকে তরল করে শরীর থেকে বের করে দিতে সক্ষম হবে। তারপর সে দ্বিগুন শক্তি নিয়ে ফিরেও আসতে সক্ষম হবে। ``

দেবদূত বললেন , ``হে ঈশ্বর আপনার তুলনা আপনি নিজেই , আপনি সত্যিই সব বিষয়েই চিন্তা করেছেন। একজন নারীকে প্রকৃত অর্থেই আপনি বিপুল বিস্ময়কর করে গড়ে তুলেছেন। ``

ঈশ্বর বললেন, ``প্রকৃত পক্ষে সে তাই। পুরুষকে চমৎকৃত করবার সকল সামর্থই আছে তার। সে যে কোন সমস্যা মোকাবেলায় সিদ্ধ হস্ত , সে অনেক ভারী দায়িত্বও বহন করতে নিপুণা। সে সুখ, ভালোবাসা এবং মতামত ধারণ করতে পারবে সেই সাথে অন্যকে প্রভাবিত করার ক্ষমতাও থাকবে তার মধ্যে। তার ভালোবাসা হবে শর্তহীন। তার হৃদয় ভেঙে যাবে যখন তার নিকট জনের মৃত্যু হবে। সে তার সবটুকু শক্তি নিয়ে জীবনে আবার ফিরে আসবে। ``

দেবদূত বললেন , ``প্রভু এটি আপনার নিখুঁততম ও পরিপূর্ণ একটি অপূর্ব সৃষ্টি।``

ঈশ্বর বললেন, ``নারীদের একটিই অপূর্ণতা থাকবে, আর সেটা হল সে বার বার তার নিজের মূল্য ও গুরুত্ব ভুলে যাবে। যার ফলে তার ভাগ্যে লেখা থাকবে নির্যাতন আর বঞ্চনা। সকল কর্ম সম্পাদন করার পরেও সে তার কৃতকর্মের কৃতিত্ব পাবে না। ``

আমরা বাস্তবেও এই পৌরাণিক উপকথার মিল খুঁজে পাই।

সনাতন হিন্দু শাস্ত্রমতে নারীকে সন্মান ও শ্রদ্ধার আসনে বসাতে বহু ধরণের বিধান রয়েছে। বৃহদ্ধর্মপূরাণে রামের জন্য ব্রহ্মার দুর্গাপূজার বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। তখন শরৎকাল দক্ষিণায়ন। দেবতাদের নিদ্রার সময়। তাই প্রজাপতি ব্রহ্মা স্তব করে দেবীকে জাগরিত করলেন।দেবী তখন কুমারী বেশে এসে ব্রহ্মাকে বললেন ,বিল্ববৃক্ষমূলে দুর্গার বোধন করতে। দেবতারা মর্তে এসে দেখলেন এক দুর্গম স্থানে একটি বেলগাছের শাখায় সবুজ পাতার রাশির মধ্যে ঘুমিয়ে রয়েছে একটি তপ্তকাঞ্চন বালিকা। ব্রহ্মা বুঝলেন এই বালিকাই জগজ্জননী দূর্গা। তিনি বোধন স্তবে তাকে জাগরিত করলেন। ব্রহ্মার স্তবে জগরীতা দেবী বালিকামূর্তি ত্যাগ করে চণ্ডিকামূর্তি ধারণ করলেন।

সেকালে মুনিঋষিরা কুমারী পূজার মাধ্যমে প্রকৃতিকে পুজো করতেন। প্রকৃতি মানে নারী, এই প্রকৃতিরই আর এক রূপ কুমারীদের মধ্যে দেখতে পেতেন মুনিঋষিরা। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে,মানুষের মধ্যেই

ঈশ্বরের অযুত প্রভাব। কারণ মানুষ চৈতন্যযুক্ত। আর যাদের সৎমন,কলুষতামুক্ত, তাদের মধ্যে আবার ঈশ্বরের প্রকাশ বেশি। কুমারীদের মধ্যে এই গুণগুলি থাকে মনে করেই তাদের বেছে নেয়া হয় এই পুজোর দেবী হিসেবে।

আর এই ধারণা থেকেই, স্বামী বিবেকানন্দের হাত ধরে ১৯০১ সাল থেকে বেলুড় মঠে শুরু হয় বাঙ্গালী হিন্দুদের দুর্গাপূজার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ কুমারীপূজা। মহাঅষ্টমী বা মহানবমী তিথিতে ভারত ও বাংলাদেশের রামকৃষ্ণ মিশনসহ বেশ কিছু মন্দিরে এই কুমারী পূজা হয়ে থাকে। সনাতন ধর্মের বহু শাস্ত্র গ্রন্তে কুমারী পূজার নির্দেশনা থাকলেও মাত্র একশত তেইশ বৎসর আগে শুরু হয়েছে কুমারী পূজার সংস্কৃতি।

মনু সংহিতায় বলা হয়েছে, যেখানে নারীরা পূজিতা হন সেখানে দেবতারা প্রসন্ন। যেখানে নারীরা সম্মান পান না, সেখানে সব কাজই নিষ্ফল। দেবাদি দেব মহাদেব যোগিনী শাস্ত্রে বলেছেন, ``শতকোটি জিহ্বায় কুমারী পূজার ফল ব্যক্ত করতে পারব না। ``

কুমারীরা শুদ্ধতার প্রতীক হওয়ায় মাতৃরূপে ঈশ্বরের আরাধনার জন্য কুমারী কন্যাকে নির্বাচন করা হয়। দেবী পুরাণেও কুমারী পূজার সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, শুদ্ধাত্মা কুমারীতে ভগবতীর প্রকাশ। কুমারী পূজার মাধ্যমে নারী জাতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। কুমারী পূজায় কোন জাতি ধর্ম বা বর্ণ ভেদ নাই। দেবী জ্ঞানে যে কোন কুমারীই পূজনীয় তবে সাধারণত ব্রাহ্মণ কুমারী কন্যার পূজাই সর্বত্র প্রচলিত।

কুমারী পূজার দার্শনিক তত্ত্ব হলো নারীতে পরমার্থ দর্শন ও পরমার্থ অর্জন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে ত্রিশক্তির বলে প্রতিনিয়ত সৃষ্টি,স্থিতি ও লয় ক্রিয়া সাধিত হচ্ছে সেই ত্রিবিধ শক্তিই বীজাকারে কুমারীতে নিহিত। কুমারী প্রকৃতি বা নারী জাতির প্রতীক ও বিজাবস্তা , তাই কুমারী বা নারীতে দেবীভাব সাধন করে তার সাধনা করা হয়। এ সাধনপদ্ধতিতে সাধকের নিকট বিশ্বজননী কুমারী নারী মূর্তির রূপ ধারণ করে, তাই তার নিকট নারী ভোগ্যা নয়, পূজ্যা। পৌরাণিক কল্পকাহিনীতে বর্ণিত এ ভাবনায়ভাবিত হওয়ার মাধ্যমে রামকৃষ্ণ পরম হংসদেব নিজের স্ত্রীকে ষোড়শীজ্ঞানে পূজা করেছিলেন। আসুন আমরা অন্তত শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবনায় এই নারী - শক্তি - প্রকৃতিকে বিশ্বব্যাপী সুরক্ষা,সম্মান ও তাদের অধিকার প্রদান করে শক্তি পূজার পরিবেশ সৃষ্টি করি।

প্রবন্ধ

মায়ের অকালবোধন

প্রিয়রঞ্জন ভকত

শ্রী রামায়ণে কথিত আছে ভগবান শ্রী রামচন্দ্র অসুর প্রধান রাবণকে বধ করার জন্য শ্রী শ্রী মা দুর্গার অসময়ে শরৎকালে পূজার আয়োজন করেছিলেন। যা সাধারণত বসন্তকালে আয়োজিত হতো। প্রাত্যহিক বা নিয়মিত অনুষ্ঠানের বাইরে মানুষ প্রয়োজনের নিরিখে কখনো কখনো এইরূপ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এক অদৃশ্য শক্তির আশীর্বাদ বা অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য। সেই প্রথা যুগ যুগান্তর ধরে চলছে এবং এখনও তার ব্যতিক্রম হয় না।

এই বছর ২২ শে জানুয়ারি উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায় রাম মন্দিরের দ্বারোদঘাটন হয়েছে এবং জনসাধারণের দর্শনের জন্য খোলা হয়েছে। হিন্দুদের বিশ্বাস ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থান যেখানেই সেই জায়গাটিতেই বর্তমান রামলালার মূর্তি বিরাজমান।

বিভিন্ন কারণে বসন্তকালের তুলনায় হিন্দু ধর্মালম্বীরা শরৎকালে মাতৃ আরাধনাকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে বিশ্বব্যাপী দুর্গোৎসব পালন করে । স্টকহলম সার্বজনীন পূজা কমিটিতে তার ব্যতিক্রম না করে এই বছর ১১ থেকে ১৩ই অক্টোবর ২০২৪ স্টকহলমের উপকণ্ঠে যারফালা(Jarfalla) জিমনাসিয়ামে(Gymnasium) অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরও শ্রী শ্রী শারদীয়া দুর্গা পূজার আয়োজন করেছে।

সম্প্রতি কিছুদিনের ব্যবধানে দুই দেশে ঘটে যাওয়া দুটি ঘটনা সারা বাঙালি জাতিকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছে।

কয়েক সপ্তাহব্যাপী সরকার বিরোধী গণ আন্দোলনের পরে শাসকদল বাধ্য হয়ে পদত্যাগ করে এবং সরকার প্রধান প্রাণনাশের হুমকি থেকে বাঁচতে কয়েক ঘন্টার মধ্যে সামযরিক বাহিনীর ব্যবস্থাপনায় বিদেশে সাময়িক রাজনৈতিক আশ্রয় নেয়।পদত্যাগ পরবর্তী কয়েকদিন সময় ব্যাপকভাবে ধ্বংসলীলায় মেতে ওঠে বিরোধী বাহিনী। এমনকি বেশকিছু প্রাণহানি ও বিশেষ কয়েকটি ধর্মালম্বীদের উপর ব্যাপক অত্যাচার হয় এবং তা এখনো কম বেশি চলছে।

এর কয়েক দিনের ব্যবধানে ঘটে গেল কলকাতার একটি সরকারি মেডিকেল কলেজের কর্তব্যরত মহিলা ডাক্তারের উপর পাশবিক অত্যাচার ও হত্যার ঘটনায় যার রেশ,এখনো অব্যহত।

উপরোক্ত দুটি ঘটনাতে যাদের এই দুটি দেশের/অঞ্চলের সঙ্গে যোগ আছে তারা তাদের মত করে এই দুটি ঘটনাতে প্রতিবাদ জানাই। আমাদের সংগঠন ও তার সদস্যরা এই দুটি ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে।

স্বাভাবিকভাবেই বিদেশে বসবাসকারী বাঙালীদের মন কমবেশি ভারাক্রান্ত। আমরাও পুজোর আয়োজন করছি নিয়ম ও প্রথাকে ধরে রাখার জন্য। উৎসবের আনন্দ বা আমেজ উধাও।

অসুর বিনাশিনী মার কাছে প্রার্থনা তুমি সেই শক্তিকে ধ্বংস করো যা আমাদের সংবেদনশীল মানুষ হতে দিচ্ছে না, আসুরিক প্রবৃত্তিগুলিকে বিকশিত করছে।

দেখতে দেখতে SSPC ২০১৩ সালে পথ চলা শুরু করে এখন কৈশোরের দিকে পা ফেলছে। গত বছর আমরা একটি মাইলফলক স্পর্শ করি। তা স্মরণীয় করে রাখার জন্য আয়োজন ছিল ব্যাপক।

প্রতিবছরের মত এই বছরেও সপ্তাহান্তে শুক্র থেকে রবি এই তিন দিন পূজার আয়োজন করা হয়।

পূজার প্রথম দিন অর্থাৎ ২০ শে অক্টোবর ২০২৩ শুক্রবার আমন্ত্রিতের অধিক জনসমাগম হয়েছিল যদিও সেটি একটি কাজের দিন ছিল। পূজা, পুষ্পাঞ্জলি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পর প্রসাদ ও নৈশ আহারের বন্দোবস্ত ছিল। স্টকহলমস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রধান মাননীয় শ্রী মেহেদী হাসান আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত ছিলেন। উনি বক্তব্যে SSPC-র পূজা আয়োজন এর প্রশংসা করেন। সমাজে অন্যায় অবিচার ও অসুর শক্তির দমনের মাধ্যমে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শারদীয় দুর্গাপুজোর উপযোগিতা ব্যাখ্যা করেন।। শনিবার পূজার সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিন। সারাদিন পূজা, পুষ্পাঞ্জলি,সন্ধিপূজা,ক্যুইজ,নাচ গান, নাটক প্রভৃতি অনুষ্ঠানে ভরা দিন। সন্ধ্যায় স্টকহলম স্থিত ভারতীয় দূতাবাসের রাজদূত মাননীয় শ্রী তন্ময় লাল সস্ত্রীক

সন্ধি পূজায় উপস্থিত ছিলেন। তার বক্তৃতায় উপস্থিত সকলকে দুর্গা পূজার সম্ভাষণ জানান।

দুর্গাপূজা হল নারী শক্তির ও তার গুণের আরাধনা যা হাজার হাজার বৎসর আমাদের পুরাতন সভ্যতাকে বয়ে নিয়ে চলেছে। ওই সন্ধ্যায় সুইডেন ডেমোক্র্যাট দলের সাংসদ মাননীয় নিমা গোলাম আলী পওর তার সংক্ষিপ্ত ভাষণে সুইডেনের উন্নয়নে ভারতীয়দের সহযোগিতার কথা উল্লেখ করেন। ভারতীয় সংস্থাগুলি বিশেষত টেকনোলজি, মেডিসিন, টেলিকমিউনিকেশন ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশাল ভূমিকা পালন করেছে সুইডেনের বাণিজ্যে। যা শুধু কর্মসংস্থানেরই সুযোগ করেনি এমনকি উদ্ভাবন ও জ্ঞানের বিকাশ ঘটিয়েছে।

এছাড়াও ওই সন্ধ্যায় আয়োজনে ডেমোক্রেট ও সোশ্যাল ডেমোক্রেট দলের জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত থেকে আমাদের পূজা আয়োজনের প্রশংসা করেন। এখানে উল্লেখ্য ২০২৩ ক্যুইজের বিষয় ছিল ভারতীয় চন্দ্রযানের দক্ষিণ গোলার্ধে পদার্পণ। পুরো অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করে অনূর্ধ্ব ১৬ বছরের বাচ্চারা।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলি ছিল আমন্ত্রণ মূলক যাতে এখানকার পরিচিত সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলি অংশগ্রহণ করে। এখানে উল্লেখ্য শিল্পীরা প্রধানত স্থানীয়।

রবিবার অর্থাৎ শেষ দিনে দশমী বিহিত পূজা বিসর্জন, সিঁদুর খেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তিন দিবসীয় পূজা অত্যন্ত আনন্দ ও উদ্দীপনার মাধ্যমে শেষ হয়। ভারতের বিভিন্ন দৈনন্দিন সংবাদপত্র ও ডিজিটাল মিডিয়া আমাদের পূজার খবর পরিবেশন করে উৎসাহ প্রদান করে।

পূজা প্রাঙ্গণে খাবার,সাজসজ্জা, বই, বস্ত্র ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের প্রদর্শনী ও কেনাকাটার আয়োজন করা হয়েছিল।

নবীন প্রজন্ম যাদের শিকড় ভারত-বাংলাদেশে রয়েছে তারা তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে দেখতে পায় এই উৎসব আয়োজনের মাধ্যমে।

অন্যান্য বছরের মতো এবারও সকল পঞ্জিভূত দর্শকদের চারবেলা প্রসাদ ও আহারের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। যেহেতু হলের আসন সংখ্যা সীমিত তাই আগাম পঞ্জিভূত করার প্রয়াস রাখা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য পঞ্জিভূত বা যোগদানের জন্য কোন আর্থিক সাহায্য আরোপ করা হয় না। স্বেচ্ছা দান ও SSPC- র সদস্যদের আর্থিক আনুকূল্যে এই পূজা পরিচালিত হচ্ছে।

য়া দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেন ন সংস্থিতা ।

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমঃ নমঃ।।

মাতৃ চরণে সকলের সুস্থ, সবল, নীরোগ দীর্ঘায়ু কামনা করে শেষ করলাম।

Anwesha Biswas

POEM

The Bells of the Past

Avinanda Ray

This afternoon i was roaming around
Thinking about olden days,
I imagined the old sound, the difference in thought grounds
The different traditional ways.

I've heard my grandmom telling about her days
When life was not the same,
She says it was much better back then
When plays were real, and not just online games.

I really didn't believe her words and tales
I showed her the technology which never even came in their dreams
How could the past, so faraway
Hold truths that lie behind the scenes?

Today, i thought to go back in time
And see the wonders of the old
Its when i felt a little sleepy
And soon, my eyes closed.

I remember everything I experienced
As i landed right from my dream to the past,
And surely enough, the roads were prettiest!
Which now, we seem to have lost.

The streets were vibrant with life and grace
With laughter that danced in the air,
Children played beneath the sun's embrace
And every moment was a precious affair.

The homes were simple, yet full of cheer
With tales of the past in every single wall,
The melodies of those days ran clear,
In every echo, every call.

I started to think of living there,
When i heard a little noise,
To my shock, those were just a dream
And the noise was just my mother's voice

I woke up and hugged her tight
And told her about my dreams,
Of the olden days which brought a cheerful light
To my heart, it really seems.

Though the past is just a fleeting light
It still echoes in my mind,
In dreams and stories, pure delight,
A bridge to the moments left behind.

প্রবন্ধ

শৈশবের ক্যান্সার: সুইডেনের স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও গবেষণার সাফল্য

ইন্দ্রনীল সিনহা

শৈশবের ক্যান্সার একটি বিরল রোগ হলেও, এটি শিশুদের মধ্যে রোগ-সম্পর্কিত মৃত্যুর প্রধান কারণ হিসেবে সুইডেনে চিহ্নিত হয়েছে। প্রতি বছর প্রায় ৩০০ শিশু এই রোগে আক্রান্ত হয়। উন্নত স্বাস্থ্যসেবা, কেন্দ্রিক চিকিৎসা, এবং গবেষণা ক্ষেত্রের বিশেষ নজর সুইডেনকে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে। সুইডেনের শিশু ক্যান্সার চিকিৎসা ব্যবস্থা ও গবেষণার অগ্রগতি অনেক দেশকে পথ দেখাতে পারে। চলুন জেনে নিই, কীভাবে সুইডেন শৈশবের ক্যান্সারের বিরুদ্ধে সফলভাবে লড়ছে।

উন্নত স্বাস্থ্যসেবা ও সরকারি পদক্ষেপ

সুইডেনের সর্বজনীন স্বাস্থ্যব্যবস্থা দেশের প্রতিটি শিশুকে বিশ্বমানের চিকিৎসা নিশ্চিত করে। ১৮ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য চিকিৎসা বিনামূল্যে, যা পরিবারের জন্য একটি বিশাল আর্থিক সহায়তা। চিকিৎসার প্রতিটি পর্যায়ে শিশুরা এবং তাদের পরিবারকে মানসিক এবং সামাজিক সহায়তা প্রদান করা হয়। এই সেবার অংশ হিসেবে হাসপাতালগুলোতে বিশেষায়িত শিশু ক্যান্সার ইউনিট গড়ে তোলা হয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র হলো স্টকহোমের ক্যারোলিনস্কা ইউনিভার্সিটি হাসপাতাল, গথেনবার্গের সালগ্রেনস্কা ইউনিভার্সিটি হাসপাতাল, এবং লুন্ড ইউনিভার্সিটি হাসপাতাল।

প্রাথমিক সনাক্তকরণ ও চিকিৎসা

শৈশবের ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রাথমিক সনাক্তকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। সুইডেনে উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে শিশুদের মধ্যে ক্যান্সার নির্ণয় করা হয়। জেনেটিক পরীক্ষা এবং মলিকুলার ডায়াগনস্টিক এর মাধ্যমে চিকিৎসা ব্যক্তিগতকরণ করা সম্ভব, যার ফলে প্রতিটি শিশুর জন্য সঠিক চিকিৎসা পরিকল্পনা তৈরি করা হয়।

চিকিৎসা পদ্ধতিতে বহু-বিষয়ক দল কাজ করে, যার মধ্যে অনকোলজিস্ট, সার্জন, মনোবিজ্ঞানী, এবং পুনর্বাসন বিশেষজ্ঞরা থাকেন। চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবে অস্ত্রোপচার, কেমোথেরাপি, রেডিয়েশন এবং লক্ষ্যভিত্তিক ইমিউনোথেরাপির ব্যবহার সুইডেনে আসাধারণ।

গবেষণা ও উদ্ভাবন

সুইডেনের গবেষণা সম্প্রদায় শৈশবের ক্যান্সার চিকিৎসায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউট সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো ক্যান্সার গবেষণায় বড় ভূমিকা রাখছে। Barncancerfonden (সুইডিশ শৈশব ক্যান্সার ফাউন্ডেশন) শৈশবের ক্যান্সার গবেষণায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ তহবিল প্রদান করে থাকে। এছাড়াও, সুইডেন আন্তর্জাতিক গবেষণা নেটওয়ার্কে অংশগ্রহণ করে, যা শিশুদের উন্নত চিকিৎসার সুযোগ প্রদান করে।

সরকারি নীতি ও জনসচেতনতা

শৈশবের ক্যান্সারের চিকিৎসা উন্নত করতে সুইডেনের সরকার একটি **জাতীয় ক্যান্সার কৌশল** গ্রহণ করেছে। এই কৌশলের আওতায় আগাম সনাক্তকরণ, চিকিৎসার গুণমান বৃদ্ধি, এবং সমান চিকিৎসার সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে।

এছাড়াও, সুইডেনে বিশেষভাবে শৈশবের ক্যান্সার সার্ভাইভারদের জন্য স্বাস্থ্যগত সহায়তা প্রদানের

ব্যবস্থা রয়েছে। দীর্ঘমেয়াদী ফলোআপ প্রোগ্রামের মাধ্যমে চিকিৎসার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়।

জনসচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে Barncancerfonden বিভিন্ন প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করে, যার মাধ্যমে শৈশবের ক্যান্সারের গুরুত্ব, প্রাথমিক সনাক্তকরণের প্রয়োজনীয়তা এবং পরিবারের জন্য সহায়তা প্রদানের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়।

উপসংহার

সুইডেনের শৈশব ক্যান্সার মোকাবিলায় নেওয়া পদক্ষেপগুলি আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত। তাদের উন্নত স্বাস্থ্যব্যবস্থা, গবেষণা ক্ষেত্রের অগ্রগতি, এবং সরকারের সহযোগিতা বিশ্বব্যাপী একটি রোল মডেল। সুইডেন শৈশবের ক্যান্সারের বিরুদ্ধে একটানা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, এবং তার ফলস্বরূপ শিশুদের সুস্থতার হার ক্রমাগত উন্নতি লাভ করছে। বিশ্বজুড়ে অন্যান্য দেশ সুইডেনের এই সাফল্য থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে, যেখানে সরকার, স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও গবেষণা একসঙ্গে কাজ করে শৈশবের ক্যান্সারের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলছে।

* প্রবন্ধের লেখক শৈশব ক্যান্সার গবেষণার সাথে যুক্ত। এই প্রবন্ধটি প্রস্তুত করার সময় ChatGPT-এর সহায়তাও নেওয়া হয়েছে।

কবিতা

তিলোত্তমা

অয়ন চক্রবর্তী

আজও তীব্র ধুপের গন্ধ , আজও তীব্র ঢাকের বাজনা;
আজও রাত্রে সে আশঙ্কায়, নেবে কেউ শরীরি খাজনা ।
করজোড়ে যে হাত করে দেবীর উপাসনা, উৎসব ;
সেই হাতেই হয় নারী জীবন শেষ , নিথর সব শব ।
মণ্ডপে মণ্ডপে যার পূজা, পুষ্পাঞ্জলিতে স্মরণ ;
তারই ভাসে লাশ, জোয়ারের জলে রূপনারায়ণ ।
যে দেবী পূজিত হয় মন্দিরে আনন্দে কলাহলে;
সে দেবীর সম্মান ধুয়ে যায় আলোকানন্দার জলে ।
যে দেবী পুজোয় লাগে একশো আট পদ্ম;
একশো আট সেলাই-এ হয় তার ময়না তদন্ত ।
ওগো তাই তুমি দিয়ো নাকো ফুল করো নাকো পুজো;
শুধু তোমার অসহায় শিকারে, মা দুর্গার মুখটি খুঁজো !

POEM

An Autumn's Prelude

Sayani Pathak

A pure white feather drifts to the floor;
Its journey seemed to fill an eternity
To the gentle air that carried it down,
Searching tirelessly for the feather's bird
Who has already flapped away.
Like how now-withered flowers prepare themselves
To meet their deaths, with contented elegance.
Still oblivious to the blazing wreaths
Of petals that still carry the scent of life,
That sing on, mere whiskers astray.
But one show's end signals another's beginning;
As final blackberries fall and first hawthorn ripens,
A certain nut, encased in spiky green shell, descends
Into ephemeral memories of a childhood—
Each tumble fleeting; it never stays.
Pinpricks of water pluck the canopy,
An accompaniment to an orchestra
That is preparing for its final encores
Before retreating backstage in hopes to play
To another loving audience, some other day.
A crisp change in the air. A golden leaf,
First of its kind, jumps—
And falls, glides, drifts… until a gentle touchdown.
I look up. A cool zephyr starts to whistle,
Reminiscent of the saccharine months that preceded it,
Its kiss is bittersweet.
I watch the world shift as though from afar

It twists and contorts, blurs its “true” colours,
Uncoils itself only to be crumpled again.
But through the distorted lens of time’s parallax,
I’ll never really know what’s true.
Every leaf imagines they’re the first to fall;
Every flower believes they’ve outlasted the rest.
But will they ever hear their own symphony
The way I do?

কবিতা

পূর্ব নির্ধারিত

মৌমিতা ঘোষ

জানি একদিন যেতে হবে সুদূরে -
সেই দূর ঠিকানায় ।
সব মায়া কাটিয়ে,
সব ব্যাথা ভুলে,
এগিয়ে যেতে হবে
উজ্জ্বল আলোর দিশায়॥

কেমন হবে সে যাত্রা !
ভাবিনি কোনদিনো ।
এখনো আসেনি মনে
"স্বর্গ বা নরক"
সবাই বলে কিসব যেন?

শুধু ভেবেছি বহু বার -
যারা পিছে রয়ে যাবে,
কষ্ট যদি হয় তাদের,
সামলাবে কিভাবে?

রক্তের বন্ধন, নারীর টান,
আর -
প্রেমের আলিঙ্গন ছেড়ে,
কিভাবে থাকবো সুখে
সেই সুদূর শান্তি নীরে ?

এসেছি যখন, যেতে হবে
এতো পূর্ব নির্ধারিত ।
তোবুও তুমি সহায় থেকো,
হে ঈশ্বর -
করোনা বঞ্চিত ॥

অকালে যেন ঝরে না যায়,
একটিও কুসুম বৃন্ত ।
তোমার আশিসে ভরে উঠুক
দিক থেকে দিগন্ত ॥

Anwesha

Article

Fasting- a practical eye opener

Dr. Abhishek Chowdhury

'Tomorrow is Ashtami, I will be fasting for Pushpanjali.'

This is a common phrase for almost all Bengalis across the world. Our mothers and grandmothers are used to taking this to the next level. They fast on certain days of different months citing religious reasons. Religious or not, fasting, the new kid on the block is gaining importance quick. Though the western medical science has only recently recognised fasting as an effective practice for different aspects of health, fasting has been popular in several cultures since ages. For a more colloquial and easier take on fasting, lets read on.

For beginners, lets understand fasting. Fasting can be loosely put as a period of abstinence from calories for a certain period. A sugary or milky coffee or tea does not constitute fasting. Only drinks such as water, black coffee, green tea are allowed.

Timing of fasting – there are various patterns with regarding to fasting. We will not make it complicated with jargons and fad terms. All of us fast when we sleep. In this period of 6-8 hours, our body heals and we abstain from any food. The easiest way to fast is to extend this period to lunch. More easily put, skipping the breakfast. Thus, if someone has finished dinner at 8 pm in the evening, a lunch next day at 12 noon makes it 16 hours fasting, 2 pm means 18 hours fasting. Your black coffee or green tea is allowed, do not worry. One might wonder what is the need to do sixteen hours or more. The easy answer to that is , the benefits of fasting become apparent if it is 16 hours or more. However, for starters, to get the feel of empty stomach being perfectly fine, it is prudent to start with 12 or 14 hrs fasting. Gradually people can get into 16, 18, 20, even 24 hours, 48 hours, 5 days and so on. However, it is always recommended that once you go 24 hours or more, do it under an expert's supervision.

Why do we need to fast? What does a small 'healthy' biscuit do to the fasting? What about eating small snack at regular intervals? Let's address these doubts.

Present human beings are a result of constant evolution which began millions of years ago. Our ancestors learned farming and agriculture much later in the timeline of our civilisation. Moreso, industrialisation and food abundance happened merely in the 1700s, which is miniscule in comparison to the millions of years of hunter gatherer habit that humans had. So now we have food on our plate whenever we want to, but our genetics and biology are same as before. The biomechanism acts in the same way as it did a million years back. The ancestors used to have food such as roots, fruits, a lucky wild boar or other animals. This was purely intermittent and not four times a day, unlike we do today. So fasting is completely natural to human body and we have evolved with it. It is only now that we have created an environment of food abundance.

Let's take a look at when did our ancestors eat. Obviously, they had to eat when the light was there – the sunlight, the only light. So, all eating started after they got the food, and all ended before dusk. Extrapolate that to the timeline. Get up at dawn, hunt and gather food, eat somewhere near midday to afternoon and that's it. So, we get an eating window and a fasting window. Does it ring a bell now? Exactly, this is what we fancy as intermittent fasting or OMAD (one meal a day). And because of this evolution, our digestive enzymes peak with the sun – maximum at noon and lowest after dark, when the sleep hormone takes over.

Now that we are on the same page that fasting has been absolutely integral to our evolution, we should agree that nature would not allow anything to continue if it was detrimental. If fasting caused any ill effects on the body, we would not have survived as a population and our hormones, their peak timings would not have evolved.

Benefits of fasting – several studies of past decade have emphasized about many benefits of fasting. But few have become as famous as autophagy. In a nutshell, autophagy is the mechanism by which body utilizes its own waste products to get energy. This is possible only when there is nutrient deprivation or as a response to stress. Mice studies and human studies have shown that autophagy helps in healing of the body. Fasting, has shown to have beneficial effects on cognitive behaviour, increased focus, better performance in addition to the phenomenon of weight loss. Weight loss is only a small by product of the many benefits of fasting. Hormone health is another important aspect of fasting. Fasting also helps the body recover from illnesses; a concept utilised by animals. They just don't eat when they are ill!!

Whenever we eat, whatever may be the composition, carbohydrate, protein or fat, there is insulin release in the pancreas. Thus, in a lifetime, there are innumerable episodes of 'releases of insulin' from the pancreas. The more it is released, the more basal level of insulin increases. Persistently raised basal insulin is, in essence the tolerance level of the body to more insulin and it gradually becomes ineffective. So, for the next time, the same effect of a unit insulin will need more insulin. This is known as insulin resistance and a direct correlate of metabolic syndrome. This can be manifested by diabetes, hypertension, polycystic ovaries, obesity and what not. So, maintaining a basal low level of insulin in the blood is important and this is taken care of by fasting nicely.

Coming to practical aspects of fasting – easier to maintain your calorie deficit and diet with fasting. No need to cook, no need to plan an extra meal. Less ingredients in the house, less cost. Try to make an eating window. For example, 12 noon to 8 pm. Thus, you will eat from 12-8, i.e. 8 hrs and fast for 16 hours. Eat healthy food in these 8 hours and eat nothing after that. Drink only water, tea, coffee- albeit no milk or sugar. Now regarding when to fast, any time is fine. However, it should fit your social life as well. For some it can be skipping breakfast, some it can be lunch. Anything that suit one's lifestyle can be fine.

To conclude, fasting has many benefits as discussed above. A well curated fasting plan can be one of the ways to maintain your weight when coupled with healthy eating and exercise. Though physiological, it is imperative that your start your fasting journey under an expert's guidance.

কবিতা

বিচার চাই

ডঃ (শ্রীমতি) গোপা মুখার্জী

কোনো দাঁড়িপাল্লা আছে কি,
যাতে " মনুষ্যত্ব " মাপা যায় ?
প্রতিবার " সভ্য মনুষ্য" - সমাজে কি
ঘৃন্য - পাশবিকতার পাল্লাই ভারী হবে ?
শিক্ষা, মানবতা, মনুষ্যত্ব, বিশ্বাস -
সব কেনো মূল্যহীন হয়ে " হালকা " হয়ে যাবে ?
আর কতজন মা ' তাঁর শুন্য কোল
পেতে বসে থাকবে ?
কতজন " বাবা " তাঁর ভাষাহীন -
চোখ নিয়ে " ন্যায় - বিচার ' চাইবে ?
কেনো গুটিকয়েক - " নর - পিশাচের " দাপটে -
সুস্থ সমাজ বার বার লজ্জিত হবে ?
নিষ্পাপ প্রাণ অকালে চলে যাবে ?
কেনো - নির্ভয়া, অভয়া, তিলোত্তমা নামে -
নরপিশাচদের হাতে প্রাণ দেবে ?
এই মাটিতে তো " নারী " শক্তি রূপেন সংস্থিতা !!

বিচার চাই, শাস্তি চাই,
অসুরদলের নিধন চাই।
হোক না " নর পিশাচ প্রভাবশালী "
হোক না " অমানুষ ক্ষমতাধারী " -
ন্যায় - বিচার চাই, অক্ষম অপরাধের
নিষ্পক্ষ যোগ্য কঠোর শাস্তি চাই !!
সুস্থ নিরাপদ সমাজে শান্তিতে আর
নির্ভয়ে আমরা সবাই " মানুষের " -
মত - বাঁচতে চাই !!

প্রবন্ধ

মেরুদণ্ড

ডঃ যশস্বী চক্রবর্তী

বছর প-ন-রা আ-গর দুর্গাপূজার সম-য়র কাছাকাছি, আশ্বিন মা-সর গরমটুকু -শষ কামড় বসিয়ে চলেছে তল্পিতল্পা গুটিয়ে -স বছ-রর মত বিদায় জানাবার আ-গ। রাত তিন-ট। সারাদিন খাটনীর পর ইমার-জন্সীর -চয়া-র -কা-নারক-ম শরীরটা এলি-য় -র-খছি। ঘুম বার বার ক-র শ্রান্ত -দ-হর আগল -ভ-ঙ ঢু-ক পড়-ত চাই-ছ। -ঠকি-য় -র-খছি। পু-জার আ-গ শহর তখন বি-য়র ঠিক আ-গর মুহূ-র্তর ক-নর সাজটুকু সাজ-ত ব্যস্ত। হঠাৎ এমার-জন্সী-ত ক-য়কজন সুঠাম অল্পবয়সী যুবক অশিতিপর এক বৃদ্ধ-ক -স্ট্রচা-র করে নামালো। ‘‘ডাক্তারবাবু . . .’’ চিৎকারের -রশটুকু মিলি-য় যাওয়ার আ-গই আমি ঘা-ড় -স্ট-থা নি-য় হাজির -রাগীর শিয়-র। স-ন্দহ আ-গই ছিল, বু-ক -স্ট-থা বসা-তই নিরশন হল। ‘‘Brought Dead’’। কিন্তু অতগুলো জোয়ান সদস্য পাশ, অপটু আমি। দি-শহারা লাগছিল, হঠাৎ -দবদূ-তর মত আবির্ভাব আমার সিনিয়-রর। ‘-দখি, সর . . .’ ব-ল সরি-য় দি-লন। ভীড় সাম-ল, ঠান্ডা মাথায় Death Declare কর-লন। তারপর আমা-ক একপা-শ সরি-য় -ড-ক বল-লন, ‘‘Never try to see if your patient is dead, try to see if he is alive.’’ ‘‘বুঝলি?’’ ব-ল, নায়ক সি-নমার শঙ্করদার মত আমার পিঠ চাপড়ে চলে গেলেন। আজ এতদিন পরও কথাগুলো মনে আছে। ‘ঠিক’, ‘কাঙ্খিত’ আর ‘স-ত্য’র সন্ধান কর-লই ‘-বঠিক’, ‘অনাকাঙ্খিত’ আর ‘মি-থ্য’ -চা-খর সাম-ন ধরা -দয়।

আজ -বশ কিছুদিন ধ-র আমার শহর উথাল পাথাল হয়ে যাচ্ছে। শুরু হয়েছিল এক যুবতী ডাক্তারের তার কর্মস্থ-ল অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা-ক -কন্দ্র করে। প্রথমে সেই হাসপাতাল, ক্রমে গোটা শহর, -দশ এবং কা-লর নিয়-ম আ-ন্দালন LOC -ভ-ঙ ছড়ি-য় প-ড় সারা পৃথিবী-ত। অবাক লাগ-লা সম-য়র সা-থ বহু আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব যা-দর সঙ্গে বহুদিন যোগাযোগ নেই, তারা ফোন করলেন, খবর নি-লন এবং সমস্ত সাহা-য্যর প্রতিশ্রুতি দি-লন। দুর্নীতি, গর্ত, দূষণ, ধর্মঘট আর -বকার-ত্ব যখন নাভিঃশ্বাস উ-ঠ -গ-ছ, তখন এই প্রতিশ্রুতি -তা সত্যিই মরূদ্যা-নর মত। ম-ন প-ড় যায় এই শহ-রই -তা সামান্য কিছু অস্ত্র আর অটুট সাহস-ক সম্বল ক-র বিনয়-বাদল-দী-নশ ‘না -ফরার সংকল্প নিয়ে’ ইংরেজ দূর্গ রাইটার্সের দিকে যাত্রা ক-রছি-লন। শ্যামবাজা-রর -নতাজীর মূর্তির পাদ-দ-শ ভা-দ্রর গর-ম কাতা-র কাতা-র মানুষ, বহু যানবাহন আট-ক। কিন্তু বা-সর কন্ডাকটার, ড্রাইভা-রর -চা-খ মু-খ -নই উ-দ্বগ, নেই বিরক্তি, তাঁরা সংযত। এ -যন তাঁ-দরও প্রতিবা-দর ভাষা। -ছাট -ছাট -ছ-ল-ম-য়রা মা-বাবার সা-থ মিছি-ল পা মিলি-য়-ছ। ভা-লা ক-র লক্ষ্য কর-ল -দখা যা-ব -তা-দর -ঠাঁট নড়-ছ ‘We want Justice’। মিছিল শেষে কেউ বা সরলভাবে জিজ্ঞাসা করেছে ‘‘মা, Justice মা-ন কী?’’

Justice মানে কাজের নিরাপত্তা, Justice মা-ন কর্মস্থল থেকে বাড়ি ফেরার নিরাপত্তা। Justice মা-ন ঈশ্বর-ক মন্দির-মসজিদ-গীর্জায় ডাকার নিরাপত্তা, Justice মা-ন জাতি-ধর্ম-লিঙ্গ নির্বিশেষে মানুষের মানুষকে ভালোবাসার নিরাপত্তা, Justice মা-ন দশ বছ-রর -ছ-লটার চা-য়র বাসন না ধু-য় স্কু-ল যাওয়ার অধিকার, Justice মা-ন -ম-য়টার নি-জর পছন্দ-অপছন্দ বলার অধিকার, Justice মা-ন সুস্থভা-ব বাঁচার অধিকার।

এই 'Justice' এর জ-ন্যই আ-ন্দালন। আর তার চা-পই এতকিছু। -কউ আজ বিচারাধীন। -কউ খুই-য়-ছন তার সম্মানীয় পদ, -কউ স্থানান্তরিত। -কউ বা জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনকে কটাক্ষ ক-র-ছন, কা-জ ফাঁকি -দওয়ার হিড়িক ব-ল। কিন্তু মন -তা তা মান-ত চায় না। ডি-সম্ব-রর রা-তও শীতঘুম -ছ-ড় যদি -কা-নাদিন -য-কা-না হাসপাতা-ল উঁকি -দন, -দখ-ত পা-বন এরাই অতন্দ্র প্রহরীর মতো যমের সঙ্গে লড়ে চলেছে জরুরী বিভা-গ, -মডিসিন বিভা-গ, গাইনী বিভা-গ - হাসপাতা-লর প্রতিটি -কাণায়। শুধু মানবতার খাতি-র। -চা-খ মু-খ ক্লান্তি থাক-ত পা-র, কিন্তু বিরক্তি নেই। সেই একই ছেলেমেয়েগুলোই তো আজ আ-ন্দাল-ন -ন-ম-ছ - ভা-লা ক-র -দখুন - ম-ন হ-ব - রবিঠাকুরের সেই পঞ্চনদের তীরের -বণীপাকা-না শিখ-দর মত নির্মম, নির্ভীক।

দোষী কে? এ প্রশ্নের উত্তর স্বল্প পরিসরে দেওয়া সম্ভব নয় ব-লই ম-ন হয়। -কা-না বি-শষ রাজনৈতিক দ-লর দি-ক আঙুল -তালা সহজ, কিন্তু যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ ক্ষমতাসীন মানুষদের আমরাই জা-ন্ত-অজা-ন্ত 'দাদা' বানি-য় তুলি। খুব -ছা-টা -ছা-টা স্বার্থ-চরিতার্থ করার জন্য দি-নর পর দিন আমরাই এ-দর পদ-লহন ক-রছি। উৎ-কাচ দি-য়ছি। মানব-ক দান-ব পরিণত করার দায় সম্পূর্ণ অস্বীকার করব কিভা-ব আমরা?

অ-ন-কই স-ন্দহাতুর 'কি হ-ব?' 'কিছু কি হ-ব?' আমার পূর্ণ বিশ্বাস নিশ্চয়ই হ-ব। সবটা না -হাক্ কিছুটা -তা হ-ব। মহামান্য আদাল-তর ওপর আমা-দর সক-লর পূর্ণ আস্থা র-য়-ছ।

এরপর -কা-না এক -ভা-র -যদিন 'কিছুটা' -থ-ক 'অ-নকটা' -সখান -থ-ক 'সবটা' ঠিক হ-ব -সদিন বাঙালীজাতি মাননীয় কবি শঙ্খ -ঘাষ মহাশয়-ক তাঁর চিরনিদ্রা -থ-ক -ড-ক বল-ব 'উঠুন কবিবর, জাগুন, দেখুন আপনার অন্ধকারে দিশেহারা মানুষটি হাতড়া-ত থাকা তার -মরুদন্ডটি খুঁ-জ -প-য়-ছ।'

কবিতা

মহামানবের অপেক্ষায়

শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়

মধ্যবিত্ত যত আমার মতো
আপন সংসার নিয়ে সুখে থাকো।
পারবে না পূর্ণ করিতে
নিও না এমন মহা ব্রত।
মোবাইলে আছে ফেসবুক
যতদিন কর্তাবাবু বন্ধ নাহি করে
কথা আর বাণী ভরে দেও
খুঁজেপেতে যা পাও অন্তরে।
চিরকাল মধ্যবিত্ত এমনই করেছে
তাহাদের মিথ্যে সুখ দিতে কত প্রাণ গেছে।
যদিও খুঁজলে পাবো ঢের ব্যতিক্রম
আমাদেরই মৃতা মেয়েটির দেখো পরিক্রম।
লেনিন স্ট্যালিন মাও হোচিমিন গুয়েভারা
সূর্যের মতন দীপ্তি স্মৃতি মাঝে শুধু ভরা।
গীতায় যা বলেছিল এখনো সত্য বলে মানি
দিব্য অভ্যুত্থান বিনা যাবে না ধরার এই গ্লানি
কখন কাহার মাঝে তাঁর, সহসা উদয় হবে
জনতার উজ্জিবীত ক্রোধ সঞ্চালনে
জমে ওঠা পাপাচার সব ভেসে যাবে।
এমনি হয়েছে শুনি
পৃথিবীর ইতিহাসে বারেবারে
সব সীমা শেষ- করা অত্যাচারে।
জর্জরিত জনতারে মুক্তি দিতে
অসীম ক্ষমতাধর মনীষীরা
আবির্ভুত হন ধরাতলে
দোষিজনে শাস্তি দিতে, চেতনা জাগাতে।

প্রবন্ধ

ওরা - ও কিন্তু আমরা - ই

ডঃ আশিস্ কুমার সিংহ

এই আশিতে এসে কাশতে - কাশতে আমি যদি এই জীবনে চাওয়া - পাওয়ার হিসেব - নিকেশ করতে বসি তাহলে মনে হবে যে আমার পাওয়ার ভাঁড়ার শূন্য -

একেবারে ফক্কা ---- কেবল ভূতের ব্যাগার খাটতে-খাটতেই পরমপিতা- প্রদত্ত এই মহার্ঘ জীবনটা আজ এমন একটা দোদুল্যমান অবস্থায় এসে ঠেকে রয়েছে যে আমার আমিকে চিনে নিতেই তো মাঝে - মধ্যে আজকাল হিমসিম্ খেতে হচ্ছে। আর এমন ও মনে হচ্ছে যে শুধু আমি কেন, এই বিদ্যেটা অন্য কোনো জনের কব্জাতে ও নেই --- সত্যি , ওয়াশরুমে ছিটকিনি বন্ধ করলে ইদানিং আমার মনে এই ভাবটাই উসখুস করে যে না, না -- শুধু আমার নয়, সকলেরই মনে হয়, এমনটাই হয় আজকাল।

এই কারণেই দূর - দূর, এগুলো এবার ছেড়ে দিন।

বুঝে নিতে কোনো অসুবিধে হয় না যে জ্ঞান দেওয়া এই বয়সের একটা বিরাট ঝোঁক --- অনেকটা নেশার মতো। ঝেড়ে ফেলবো - ফেলবো ভাবলে ও, ফেলা যায় না।

হ্যাঁ, এবার বলি যে আমি ও তো অন্যদের জ্ঞান দিতে, না- না জ্ঞান দেওয়াটা নয়, বোঝানোর ক্ষেত্রে আমরা তো কখনোই পিছিয়ে আসার পাত্র নই --- আমরা সকলকেই সকলকে মরিয়া হয়ে বোঝানোর চেষ্টা করে চলেছি, ব্যস্।

এইমাত্র মনে পড়ে গেলো যে মা আমাকে প্রায় বলতেন --- ওরে, তোর অভ্যেসটা একেবারেই বিগড়েছে বাবু। তুই তো আজকাল আমাকে ও ছাত্র মনে ক'রে রাত -দিন জ্ঞান দিয়েই চলেছিস্, এগুলো বাদ দে এবার। এগুলো বাদ দে।

প্রতিবাদ করলেও এটা তো সত্যি যে মা ঠিক তো বলছেনই -- তবু ও সজোরে প্রতিবাদ করে আমি কিন্তু অন্যদের ম'তোই নিজেকে এগিয়ে রাখার ক্ষেত্রে কখনই পিছিয়ে থাকি নি।

আর মজার ব্যাপার হলো এই যে বোঝানোর চেষ্টাটা করি আমরা সকলেই, তবে বোঝার চেষ্টা করি না কিন্তু কেউই। সত্যি, আমি কখনও করি নি আর আজও করি না।

তবে আমি ঠেকে শিখেছি যে এগুলো এবার ছাড়তে হবে।

সন্তান আমার, আমি ওদের বাবা ---- আমি যা বলবো, নিশ্চয় ওদের ভালোর জন্যেই বলবো। না - না, এটা বাবা কিংবা অভিভাবক হিসেবে শুধু আমার কথা নয়, আমি জানি -- সকলের মনের কথা এটাই। এই কারণেই

কোনো প্রশ্ন না তুলে, উচিত - অনুচিতের দোহাই না দিয়ে সেই আদ্যিকাল থেকে এটাই চলে আসছে।

আমাদের বাবা - মায়েরা যখন যা - যা বলেছেন, আমরা করেছি আবার দেখেছি , আমাদের বাবা - কাকারা ও এমনটাই করতেন ----

ফলে আজ আমাদের সকলের মনেই এই ভাবটা একেবারে গেঁথে গেছে যে তাঁরা যা কিছু বলেছেন আর করেছেন --- সেটা বা সেগুলো নিশ্চয় ভালোর জন্যই। নাহ্, এর অন্যথা হয় না, হতেই ও পারে না। এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই, প্রশ্ন হয় ও না আর প্রশ্ন ওঠে ও নি--- কিন্তু, কিন্তু ------- প্রশ্ন উঠছে আজকাল।

আজকে আমাদের ব্যবহারে,

সন্তানদের প্রতি আমাদের দিশা নির্দেশে, তাদের প্রত্যেকটি কাজে আমাদের অবাঞ্ছিত (?) হস্তক্ষেপে, বোঝা যাচ্ছে যে নতুন প্রজন্ম সত্যি - সত্যিই আজ অসন্তুষ্ট --- আর তাদের এই মনোভাব আজ আর চাপা নেই --- আর শুধু হাবে - ভাবে নয় - এটা ইদানিং ঝড়ের ঝাপট নিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

না - না, এর ও ব্যতিক্রম আছে, এখন ও নিশ্চয় আছে। ---- তবে এই সমস্যাটা কয়েক বছর আগে ও

একটা কাঁচের গুলির মতো ছোট্ট চেহারায় ছিল --- আর এখন ? উরি বাবা ----- আমি নিশ্চিত যে দু - এক বছরের মধ্যেই এটা ফুটবলের দাপ নিয়ে কোনো ব্যাকরণ না মেনেই চারদিক দাপিয়ে বেড়াবে--- রেফারির প্রয়োজনই হয়তো হবে না আর ।

গ্রহ- দোষে কি এমনটা ? মনে হচ্ছে না ? তাহলে ? কার দোষে ? --- দায় কার - আমার ? আমাদের ? না আজকের পরিস্থিতির ?? --- এর ভালো - মন্দ দিকগুলো নিয়ে আমরা ভাবছি অ নে ক , অ নে ক --- কিন্তু কিনারায় পৌঁছুতে পারি নি । মজাটা হ'লো এই যে গবেষণা যতই করি না কেন --- রেজাল্ট হিসেবে এখন ও একটা বড়ো ' 'গোল্লা ' ছাড়া পাতে কিছুই কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না । তার পরেও কাটা - ছেঁড়া কিন্তু " চলছে - চলবে " ও ।

তবে একটা কথা সত্যি যে নতুন প্রজন্ম নিজেদের নিয়ে খুব ব্যস্ত , খুব তারা একাগ্র আর উৎসাহী । এরা ছুটছে , ছুটতে -ছুটতেই নিজেদের টেনে চলেছে একটানা । তবু ও , ক্ষমা করবেন --- আমার তো মনে হয় যে ওদের ব্যাপারটা যেন অনেকটাই পথভ্রষ্ট পথিকের মতো। সঠিক নির্দেশের অপেক্ষায় ? হবে ও বা ।

এই প্রজন্ম আজ এতটা ব্যস্ত , এ ত্তো টা - ই , যে এই বিষম পরিস্থিতিতে তাদের জন্যে কিছু একটা করতে পারলে--- তাদের ইচ্ছে , চাহিদা কিংবা কোনো - কোনো আবদার পুরো করতে পারলে , আমি জানি যে আমার মতো এই বয়সে ও আপনি তৃপ্তি পেতেন --- খু উ ব ভালো ও লাগতো । কিন্তু বিশ্বাস করুন --- শুধু পাওয়ার জন্যই নয় , দেওয়ার জন্য ও ভাগ্যের দরজায় ঘা দিতে হয় হামেশাই । (আজকের অবস্থা : " মায়ের ভাগ্যে নেই, যাদু কোলে করি / যাদুর ও ভাগ্যে নেই , মায়ের কোলে চড়ি ") ।

আমি বিশ্বাস করি যে আগ্ বাড়িয়ে কিছু একটা করার চিন্তা এই দুর্বল মুহূর্তে আপনার মাথায় এলেও সেগুলোকে আপাততঃ নিজের ম'তো করে নিজের মনে সাজিয়ে রাখাটাই আজকের পরিস্থিতিতে ' হয়তো ' আপনার সঠিক পদক্ষেপ হবে । কারণ ---- ওরা ব্যস্ত ---- নেই , নেই ---- সময় যে নেই ।

মনে রাখতে হবে শুধু নয় , মেনেই নিতে হবে যে আমাদের কচি - কাঁচারা এবার সত্যিই বড়ো হয়ে গেছে ---- নিজেদের ভালো - মন্দ ওরা এবার নিজেরাই বুঝতে শিখে গেছে আর মোদ্দা কথা হ'লো এই যে ওদের মনে এই বিশ্বাসটা ও জন্মেছে (?) যে আমাদের বাদ দিয়েই এবার ওরা নিজেদের মতো ক'রে এগিয়ে যেতে পারবে --- আমাদের আর কোনো দরকার নেই । ওদের কাছে আমরা এখন ' অতিরিক্ত ' খেলোয়াড়দের মতোই " দ্য মাস্ট "।

তখন ওদের নিয়ে ওদের জন্য ছোটাছুটি করার দরকার ছিল---এই কারণে আমাদের ও তখন সঙ্গে থাকার দরকারটা ছিল কিন্তু এখন সেই দরকারটা ফুরিয়ে গেছে আর ব্যস্ --- আমরা ও ফুরিয়ে গেছি , আমরা ' ভ্যানিশ ' --- আর এটাই হচ্ছে আজকের দিনের সোজা বাংলা ।।

সময় থাকতে এই সহজ সত্যটা ' ' সমঝে ' নিয়ে সেই অনুসারে নিজেকে চালালে মনের দিক থেকে নিজে কতটা স্বস্তি আর শান্তি পেতাম , কতটা চিন্তা মুক্ত থাকতাম --- এগুলো আমি কিন্তু আজ ও বুঝে উঠতে পারি নি তবে পরিজনেদের ইপ্সিত স্বস্তি দেওয়াটা যে অনেকটা সহজতর হ'তো --- এটা কিন্তু ঠিক ।

আজ বার - বার মনে হচ্ছে যে নিজেদের মাত্রা - অতিরিক্ত স্নেহ - দুর্বলতার জন্য নতুন প্রজন্মের এগিয়ে চলার সময় অনেক ক্ষেত্রেই হয়তো আমাদের মাতব্বরি করাটা ---- ' মাতব্বরি ' অর্থাৎ প্রতিটি ক্ষেত্রে আগ্ বাড়িয়ে এগিয়ে যাওয়াটা , সত্যিই , হয়তো সময়োপযোগী হয় নি । হ্যাঁ, ভুল হয়েছিল ।

তবে হ্যাঁ ,যথা সময়ে নিজেকে আমি সংশোধিত করি নি । কারণ হিসেবে বলবো যে হয়তো অজ্ঞতা বশতঃ করতে পারি নি কিংবা এটা ও হ'তে পারে যে আমি চাইনি বলেই করি নি কিংবা সরে যাওয়ার গুরুত্বটাই আমাদের পুরোনো মাথা যথাযথ বুঝে উঠতে পারে নি ।

তবে ভুল --- অযাচিতভাবে এগিয়ে যাওয়াটাই আমার ভুল ছিল ।

এখন দিব্যি বোঝা যাচ্ছে যে পায়ে - পায়ে এগিয়ে চলার পথে আমার নিজের অজান্তেই আমার মধ্যে অহরহ বদল হয়ে চলেছে । তবে বদলটা আসছে এক্কেবারে চুপিসারে আর গুটি- গুটি পায়ে এসে সেটা আমাকে এক্কেবারে নিজের ক'রে নিয়েছে --- মনে হচ্ছে যেন নিয়েছে কব্জা ক'রে । আমার ব্যবহারটা কেন আমি সেটা জানি না কিন্তু অনেকটাই যেন বদলে গেছে। বদলে গেছি আমি । হ্যাঁ , হ্যাঁ ---বুঝতে পারছি যে আজকের আমি যেন সেই আমি নই ।

--- এই যেমন আমি তো এতদিন ভেবে এসেছি যে আমি ভালবাসি শুধুমাত্র আমাকেই মানে আমার প্রিয় কেবল আমিই । কিন্তু ইদানিং ভালোবাসা পাওয়ার জন্যে তো বটেই , দেওয়ার জন্য ও আমার আকুলতা এতটাই বেড়ে গেছে যে আমি - আমি চিন্তাটাও

আমাকে ছেড়ে মনে হচ্ছে যেন একটু হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। আমার আমিটা যেন আজ অনেকটা হেরেই থ' মেরে ব'সে।

আগে পাওয়ার ইচ্ছেটাই আগে - আগে চলতো আর আমি চলতাম তার পিছু - পিছু। কিন্তু এই পরিণত বয়সে মনে হচ্ছে যেন দেওয়ার ইচ্ছেটাই ছুট লাগিয়েছে বেশ জোর কদমে।

আমার আমি মুখ নামিয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে পিছনে- পিছনে আর অন্য এক আমি যেন এগিয়ে গেছে কয়েক পা। বাহ্ --- মন্দ কিছু লাগছে না কিন্তু।

মন দেবার জন্যই আজ এগিয়ে আছে। স্বীকার ক'রে নিচ্ছি যে আমার কাছে এই ধাতের অভিজ্ঞতাটা খুব একটা পুরোনো নয় কিন্তু আজ এটাই তো বাস্তব। আমি আজ পাওয়ার কিংবা নিজের জন্যে গুছিয়ে নেওয়ার জন্যে নয়, ভালোবাসা দেওয়ার জন্যেই মুখিয়ে আছি।

কিন্তু হঠাৎ দেখা দিয়েছে একটা নতুন 'সমিস্যা'। দেওয়ার অপেক্ষাতেই আমি আছি কিন্তু কাকে দেবো আর নেবেটা-ই বা কে ? -- কে আছে অপেক্ষায় ? আমার কাছ থেকে নেওয়ার প্রত্যাশায় ? নাহ্ -- কেউ নেই।

সম - মনস্ক জনেরা ছিল, হ্যাঁ -- এক সময়ে ছিল বটে দু - চার জন তবে তাদের মধ্যের দু-একজন আবার দেখছি কখন ফুড়ুৎ হ'য়ে গেছে ----- আমি তাদের পছন্দের 'লিস্টি -' তে আর নাকি নেই।

তবে বাঁচতে হবে তো শিরদাঁড়া সোজা রেখে। হ্যাঁ, খারাপ লাগছে -- কষ্ট তো হচ্ছেই। প্রতিটি পদক্ষেপে এখন একাকিত্বের নিদারুণ যন্ত্রণার মুখোমুখি হচ্ছে --- তবু ও মেনে নিতে হচ্ছে --- নিতে তো হবেই। এরই নাম জীবন।

একা লাগে --- মাঝে - মাঝে ভীষণ।

কিন্তু কি আর যায় করা ---- এদিকে ভালোবাসা দেওয়ার জন্যে আমি / আপনি মানে আমরা ব'সে আছি কিন্তু নেওয়ার জন্যে কেউ নেই। এটা একটা ভয়ঙ্কর মানসিক নির্জনতা।

তবুও বাদ দিতেই হবে এগুলোকে।

বয়স বাড়ছে, বোঝা - র বোঝাটা ও প্রতিদিন টুক - টুক ক'রে বড়ো হচ্ছে। আর এখন আবার একটা উটকো বিভ্রাট ঘা দিচ্ছে।

--- আরে হ্যাঁ, আমার ও বন্ধু ছিল কয়েক জন ---- নিজেদের মধ্যেকার সম্পর্কটা ও ভালো ছিল, -- - বোঝা- পড়াটাও মন্দ কিছু ছিল না কিন্তু আজ তাদের মধ্যের দু - চার জনের সঙ্গে আমার হঠাৎ - ই আড়ি গেলো --- সম্পর্কে মাধুর্যের রেশটুকুও আজ নেই। নেই তো নেই, এটা চলবে --- এতে বিরাট অসুবিধের কিছু নেই কিন্তু যে অসুবিধেটা মনে টানা কষ্ট দিচ্ছে, সেটা হচ্ছে এই যে, কি বলবো --- বলতে খারাপ লাগছে কিন্তু -- কিন্তু, আগেকার সুসম্পর্কের সুবাদে তারা আমার বিরুদ্ধে অহেতুক উঠে- প'ড়ে লেগেছে। ---- হ্যাঁ -- হ্যাঁ, পিছন থেকে অতর্কিতে ছুরিকাঘাত করার মতোই এটা ভয়াবহ কিন্তু তবুও --- মন বলছে এগুলোকে মুছে ফেলতে --- সটান ছুড়ে ফেলতে হবে।

ইদানিং আমার প্রায়ই মনে হচ্ছে যে কোনো একটা সময়ে বাড়ির দায় - দায়িত্বগুলো আমার আকার- প্রকার কিংবা

সামাজিক অবস্থান দেখে আমার চারদিকে শুধুমাত্র ঘুর - ঘুর না ক'রেই আমাকে সেগুলোর পিছনে হ্যাংলা র মতো ঘুর - ঘুর করতে দেখে কোনো এক দুর্বল মুহূর্তে সে নিজেই টুক ক'রে চড়ে বসেছিল আমার কাঁধেই।

আরে - আরে, আমার মতো আপনিও এই একই ব্যামোতে ভূগছেন ? এর একটা নেশা আছে, বুঝেছেন তো ? -- ধরলে ছাড়া যায় না সহজে। আর আমি তো সাধ্য মতো চেষ্টা ক'রে এসেছি বাড়ির আপনজনেদের সাধ মেটাবার। ---- একেবারে অযাচিতভাবে। কি ? কি ? আপনি এখন ও ছুক - ছুক ক'রে চলেছেন করার জন্যে। তা বেশ -- তা বেশ। এটা কোনো অপরাধ তো নয়। আর সত্যি, আপনি ভুল করছেন না। আপনি সৎ, মহৎ ---- আজকের দিনে আপনি একটা উদাহরণের ম'তো। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।

তাহলে ভূতের ব্যাগার খাটা আপনার ও পছন্দের ---- মানে দায়িত্বের প্রতি একটা স্বাভাবিক দায়বদ্ধতা প্রথম থেকেই আপনার ছিল --- আর এটা বুঝতে পেরেই দায়িত্ব বাবাজীবন টুক্ ক'রে চেপে বসেছিল আপনার কাঁধে এক সময়ে, এই তো ! --- ঠিক আমার - ই ম'তো। আপনার মতো একটা 'পাকা বোকা -'র দেখা পেয়ে আমার মনটা আজ বেশ 'ফুলকো - ফুলকো' লাগছে। কেন ? কেন আবার ? এক্কেবারে খোঁজা- খুঁজি না করেই ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে আরো একজনকে দেখলাম --- ভালো লাগছে।

আমার মন বলছে যে দায়িত্ব নিয়ে তখন আপনার ও ভালো লেগেছিল --- আমার ম'তোই। খুব ভালো লেগেছিল আমার ও। নিজের মতো ক'রে

ছোটাছুটি ক'রে আপনি অন্যদের ছোটাছুটি করার মতো করে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন , এই তো ?ফাইন । এটা এমন কোনো নতুন কথা নয় -- পুরোনো পাঁচালী --- অনেকটা আমার মতোই । অবশ্যই , আপনি আমার ম'তো ক'রে এখনও চেষ্টা চালিয়েই চলেছেন ! ভালোই ।

না- না , কেউ আপনাকে কিছু করার জন্য চাপ দেয় নি , করতে বলে ও নি --- আপনার ' আপনি -' ই আপনাকে চুপি- চুপি বলেছিল আর আপনি সেই কারণে এখন ও নিজের ম:তো ক'রে চেষ্টা করে চলেছেন । ব্যস্ ---- এই তো ! সত্যি , আমাদের মধ্যে মিল তো অনেক ! !

ইতিমধ্যে মা - বাবা গত হয়েছেন । ছোটরা বড়ো হয়েছে , আর তাদের ও ' পাখা ' (?) গজিয়েছে । ---নিজেদের ভালো - মন্দ তারা বুঝতে শিখেছে --- এগিয়ে চলেছে নিজের ম'তো ক'রে । তবে মন ভেঙ্গে যায় এটা দেখে যে তাদের চিন্তার ' লিস্টে '-র কোথাও আমাদের জন্যে তো বটেই , হয়তো তেমনই আপনাদের জন্য ও ফক্কা । তবে এমনটা না ও হ'তে পারে --- যদিও সচরাচর হ'য়ে থাকে এমনটাই ---- না - না , ব্যতিক্রম আছে ,তবে খুবই কম ।

মোদ্দা কথা এখন হচ্ছে এই যে বাছারা এখন ইচ্ছেমত উড়তে শিখেছে --- সঙ্গে রাখার , সঙ্গ পাওয়ার কোন তাগিদ তাদের নেই । -- আর বুঝতে শিখেছে যে এই " বুড়ো - হাবরা মতলববাজেদের " ছাড়াই তাদের জীবনটা টুকদুম- টুকদুম ক'রে শুধু চলবে না , মেজাজে দৌঁড়ুবে।।।।

আজ এই ধাতের ' তথা কথিত আত্ম ভোলারা ' আমার / আপনার এই ধরণের পরস্মৈপদী কাজকর্মকে কোনো গুরুত্বই দিতে নারাজ । ওঁদের ব্যাখ্যা --- বাব্বা , ওদের এতো ছোট মন , জানতাম না তো ! ছ্যা - ছ্যা , আগে বুঝতে পারলে আধ- পেট খেয়ে ---- অন্যের বাড়িতে ভিক্ষা ক'রে , না- না ---- - ঝি- গিরি ক'রে ও খেতাম ইত্যাদি - ইত্যাদি ।

আর এদিকে কষ্ট স'য়ে -

কিছু না কিছু পারিপার্শ্বিক কষ্টের মুখোমুখি হয়ে আপনি

একেবারে স্বেচ্ছায় কিছু একটা করেছিলেন কিংবা আমি করেছিলাম একেবারে নিজের বিবেকের তাগিদে -- সত্যি, কোনো লাভের লোভে নয় --- তবে হ্যাঁ , একেবারে বিনা লোভে ও কিন্তু বলবো না -----হ্যাঁ - সত্যিই , লোভ ছিল ভালোবাসা পাওয়ার , আদর - যত্ন পাওয়ার । মিষ্টি ব্যবহারের পাওয়ার একটা চাপা ইচ্ছে সত্যিই , আমাদের ছিল । কিন্তু নিজেদের বিবেকহীনতা , অদূরদর্শিতা আর আত্ম - সর্বস্বতার জন্য আজকের দিনে সেগুলো আর ভাগ্যে জুটলো না , জুটলো একটা বিরাট গোল্লা ।

অন্য দিকের ' তক্কো ' ও কম জোরালো নয় । কাকা , না -- না ---- আপনি অন্ততঃ এক বারটি শুনে নিন। না- না ,--- আপনাকে শুনতেই হবে । হ্যাঁ , আমাদের অভাবে - অসুবিধেয় আপনারা করেছেন । তবে কি করেছন , করছেন ---- আর পেয়ে কতটুকু আমাদের লাভ হয়েছিল --- সেটা জানি না। তবে শুনেছিলাম যে না চাইতেই আপনারা করেছিলেন কোনো এক সস্তার আমলে আর এখন মনে হয় যে আপনাদের সামনে তখন অন্য

কোনো ' অপশন ' ছিল ও না । তবে হ্যাঁ , করেছিলেন এটা ঠিক । না- না কাকা --- একটু বসুন ---- প্রসঙ্গ তুলছেন যখন , শুনতে তো হবেই ।

হ্যাঁ , আপনি তো নিজে ও জানেন যে পেট দিয়েছেন যিনি --- অন্ন ও জোটাবেন তিনি । মানে আমাদের দিকে দু - চার আনা এগিয়ে না দিলে ও কাকা , আমরা এখন যেমন বেঁচে আছি , ঠিক তেমন- ই তখন ও বেঁচে থাকতাম । এটা ও তো বোঝেন আপনি যে আজকের দিনে ' বাইরের ' কোনো চাপ নেওয়াটা --- না - না বলুন তো , কত্তো কষ্টের । ধন - দেবতা ও ফেল মেরে যাবেন আর আমরা তো কোন ছার । এদিকে নিজেরাই তো ওভার - ক্রাউডেড । আর এত্তো

সব মাইন্ড করলে হয় ? সস্তা ' সেন্টি ' ? যত্তো সব বোগাস্ । --- আর কথায়- কথায় চোখের জল (?) -- - ---আমাদের অকল্যাণে জন্য ? -- বলুন তো , ছ্যা- ছ্যা । ন্যাকামো যত্তো সব । আমরা কি বুঝি না ----- বদ্ মতলব এগুলো --- ।

সত্যি বলছি , তখন কি করেছিলেন , কেন করেছিলেন -- সে বিষয়ে আমরা কিছুই এখন বলতে পারবো না --- তবে নিজের বুকে হাত রেখে আপনি বলুন তো কাকা --- কখনো যদি কিছু ক'রেই থাকেন - - তা হলে কি সারাটা জীবন আমাদের সকলকে হাত জোড় ক'রে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে ? না - না , সেটা পারবো না । ব্যস্ ।

আর --- ওদের পক্ষ নিয়ে আপনি এই টানা ঘ্যান- ঘ্যান করাটা এবার ছাড়ুন কাকা !

শান্তিতে নিজে থাকুন আর থাকতে দিন আমাদের ও , প্লীজ । ভাল্লাগে না ।

ব্যস্ , এবার আপনার মুখ ও বন্ধ হয়ে গেলো -- আপনি হ'য়ে গেলেন চোর ।

এদিকে মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে । হয়ে গেছে চাকরি থেকে ছুটি । আমাদের বয়স বেড়েছে আর কমেছে নিজেরদের ওপর ভরসা --- বিশ্বাস । বার - বার মনে হচ্ছে যে এখন সামনে কোনো একজন এসে দাঁড়ালে বড্ড ভালো হ'তো । জোরটা বাড়তো -- আর একাকিত্বের ভয়টা কেটে যেতো অনেকটাই।

বলা ঠিক হবে --- নাহ্ ,

হবে না --- ঠিক হবে কি হবে না , এই দোটানার মধ্যেই অনেকটা আমতা - আমতা করে নিজেদের দুর্বলতার দিকটা জানিয়েই দিলাম সেদিন আর মুহূর্তের মধ্যেই শুনতে পেলাম " অভয়- বাণী " ---- " মৈ হুঁ ন " --- আশ্বস্ত হলাম । ভালো লাগলো । খুব ভালো লাগলো । ---- বাহ্ --- আমাদের

কপালটা তাহলে তো রীতিমতো চওড়া । নাহ্ , ভাগ্যটা মীরজাফর তাহলে নয় !! মেঘ ঠিক ভাবে জমাট বাঁধার আগেই ঝমাঝম্ বৃষ্টি । সুখবর ।।

-- বাবা - মায়ের বিরাট একটা আশীর্বাদ না হ'লে কি আর এগুলো পাওয়া যায় ?? -----

নিজেদের ফুলকো- ফুলকো লাগছিল --- অনেকটা টেনশন- মুক্ত হওয়া গেলাম তাহলে !!

আর হবো'ই না বা কেন ? ------- এই না হলে নিজের রক্ত ?---- রক্তের একটা টান তো থাকবেই !

আমাদের মুখে তখন চওড়া হাসি।

তবে ঘোরটা কাটতে দেরি হয় নি । পাশের ঘর থেকে ভেসে এলো চাপা হাসি --- কেমন দিলাম গোছের ।----- এটাই আজকাল হয় --- এটাই ' দ্য লেটেস্ট "।

আপাত অপ্রাসঙ্গিক ব'লে মনে হলেও অন্তিমে সানন্দে স্বীকার করে নিতে কোনো লজ্জা নেই যে যারা আমার কাছে আপনার চেয়ে ও আপন --- সেই আপনারা কোনো পথভ্রষ্ট আত্মনেপদী অজ্ঞ অবজ্ঞার পাত্র কিন্তু নন। আপনারা স্মরণীয় --- বরণীয় ও বটেন।

আর হ্যাঁ , আমার ' লটে 'র প্রথম দিকের দু - একটা আঙ্গুর টক্ ছিল ব'লে পুরো লটের সঙ্গে আড়ি ক'রে আমি মুখ ঘুরিয়ে ব'সে থাকবো --- বাড়ি কিন্তু আমাদের সেই জাতের শিক্ষা দেয় নি ।

নিজেকে নিয়ে অনেক কাটা - ছেঁড়া করার পরে এই সত্যটা জগৎ সভায় আজ প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত হ'য়ে গেছে যে আমরা ' অদ্ভুত ' প্রজাতির এমন এক ধরণের প্রাণী যারা নিজেদের কষ্টের চেয়ে

অন্যদের আনন্দ দেখেই কষ্ট পাই বেশি ।

এই কারণে নিজেদের কষ্ট নিবারণের চেষ্টা আমরা তো নিবিষ্ট চিত্তে ক'রেই চলেছি , অন্য দিকে আবার তেমনই জন চক্ষুর অন্তরালে অন্যের " আনন্দ- লাঘবে -" র

প্রচেষ্টাটা ও কিন্তু দিব্যি মনের আনন্দে চালিয়ে যাচ্ছি আর এটাকে আমরা জাতির একটা অবিস্মরণীয় কৃতিত্ব হিসেবে চিহ্নিত ক'রে আনন্দ পাই -- কেন জানি না , এই বিশ্বাসটা আমার মনে আজকাল দৃঢ় থেকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছে !!

আসলে অন্যের শ্রী বা উন্নতির মধ্যে একটা বাড়- বাড়ন্ত গোছের কিছু একটা দেখলে

বলতে খারাপ লাগছে কিন্তু সত্যি কথাটা হচ্ছে এই যে আমাদের চোখ টাটায় --- অসময়ে জ্বালা করে চোখ দুটো আর আমরা ' নতুন ' ক'রে আবার নিজেদের জন্যে অযথা উতলা হ'য়ে উঠি ।

কেবল " আমি খাঁটি - আমিই খাঁটি " এই ভুল ধারণা অবিরত মনে ঘা মারতে থাকায় ---- আমার এটা কেন নেই , ওটা কেন নেই --- আরে ব্যস্ , আর এগুলো তো কেবল আমারই হওয়া উচিত ছিল , ওর কেন --- এই জাতীয় অন্যায় দাবিগুলো আমাদের অমানুষ ক'রে তোলে ।

বুঝতে পারি যে এই ব্যবহার প্রশংসনীয় তো নয়ই ---- সোজা বাংলায় ---- নিন্দনীয় , ঘৃণ্য ও --- ঝেড়ে ফেলে দিলেই মঙ্গল - কিন্তু নাহ্ , ছাড়তে আমাদের বয়েই গেছে !! --- এটাই তো আমাদের ' বাঙ্গালীয়ানা ' ।

বাস্তবে আমরা মূঢ়মতি ---- আমাদের যে কি পরিণতি হবে , সেটা অজানা কিন্তু অন্যের পথ অবরুদ্ধ করার

' কারুকার্যগুলো ' আমরা কিন্তু ভালোই রপ্ত করেছি ।

এই কারণেই , আমরা বাঙ্গালি হয়েই বেঁচে থাকলাম , মানুষ আর হ'তে পারলাম না ।

তবে ' মানুষ ' হওয়ার লোভ মাঝে - মাঝে আমাদের যথার্থ বিব্রত ক'রে তোলে ব'লেই আমরা এখন ও মাঝে- মধ্যে নিজেদের মতির গতিপথ পরিবর্তনে চেষ্টা করি --- সেই সঙ্গে বিশ্বাস করি যে যোগ্য সঙ্গীর সাহচর্য পেলে অচিরেই সুফল ফলবে ।

আমরা সকলেই এখন রিটায়ার্ড (টায়ার্ড নই) আর এটাই আমাদের আজকের পরিচয় । আমরা আগে কে কি ছিলাম ---- পদ - পদবী কিংবা সম্মান - দক্ষিণায় কে ছিলাম এগিয়ে ছিল --- সেগুলোর হিসেব - নিকেশে এখন ব্যস্ত থাকার অর্থই হ'লো বয়সের সৌন্দর্য - গুরুত্ব - অভিজ্ঞতা - গাম্ভীর্য আর তার আভিজাত্যকে অগ্রাহ্য করা । এক্ষেত্রে আমাদের সতর্ক হ'লেই মঙ্গল ।

এগুলো ভুলে গেলেই ব্যস্ --- পিছনে বাঘ আছে ---- গিলে নেবে অবশিষ্ট জীবনের সৌন্দর্য্য - শান্তি - সমৃদ্ধি আর সৌহার্দ্য ।

আসুন না , কালকের জন্যে আজ থেকেই আমরা যে কোনো ধরণের সংকীর্ণতার সঙ্গে আড়ি ক'রে দিই ।

ভালো থাকুন । আনন্দে থাকুন আর সকলকে আনন্দে রাখুন ।

প্রণালী

রুই মাছের মুড়োর মুড়িঘন্ট

ঝর্ণা সিনহা

উপকরণ

1. গোবিন্দভোগ বা বাসমতী চাল - 250 গ্রাম
2. বড় রুই মাছের মুড়ো - 2টো নুন হলুদ মাখানো
3. মাঝারি মাপের পিঁয়াজ - 4টে কুচানো
4. কাজু - কিসমিস আন্দাজ মতো
5. ছোটো এলাচ - 4টে
6. লবঙ্গ - 6টা
7. দারচিনি - 4 টুকরো
8. সাদা তেল - 10 চামচ
9. ঘি - 2 চামচ
10. তেজপাতা - 2 টো
11. কাঁচা লঙ্কা - 2 টো
12. আদাবাটা - 1 চামচ
13. নুন পরিমাণ মতো
14. চিনি - 4 চামচ
15. গোলাপ জল - 1 চামচ

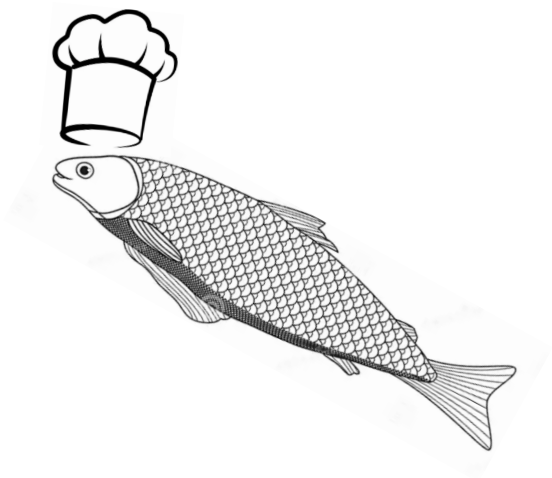

রুই মাছের মুড়োর মুড়িঘন্ট বানানোর পদ্ধতি

250 গ্রাম চাল ভালো করে ধুয়ে একটা বড় ছাঁকনিতে জল ঝরতে দিতে হবে।

মাছ এর মুড়ো গুলো লাল করে ভালো ভাবে ভেজে নিতে হবে। তারপর কড়াইতে সাদা তেল দিয়ে সেইটা গরম হওয়ার পর কুচানো পিঁয়াজ বাদামি করে ভেজে,ছোটো এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি থেতো করে ফোরন দিতে হবে। তারপর দুটো তেজপাতা দিয়ে দিতে হবে।

এবার চাল টা একটা বাটি বা গ্লাস এ মেপে নিয়ে কড়াইতে দিয়ে একটু ভেজে নিতে হবে। আদাবাটা,আন্দাজ মতো নুন এবং চার চামচ চিনি দিয়ে এতে কাজু - কিসমিস দিয়ে ভালো করে ভেজে নিতে হবে।একটু লালচে রং হলে এবার জল দিতে হবে। যে বাটিতে চাল মাপা হয়েছিল সেই বাটির মাপের দুবাটি জল দিতে হবে। এবার এতে কাঁচালংকা টুকরো করে দিয়ে মাছের মুড়ো গুলো চার টুকরো করে ভেঙে দিয়ে দিতে হবে। তারপর কড়াইটা একটা ঢাকনা দিয়ে ওভেনটা একটু কম আঁচে করে রাখতে হবে। 10 মিনিট পর হয়তো হয়ে যাবে। ঢাকনা খুলে দেখে নিয়ে ঘি এবং গোলাপ জল দিয়ে দিলেই তৈরি রুই মাছের মুড়োর মুড়িঘন্ঠ।

প্রণালী

চিলি চিকেন

দীপান্বিতা দে

উপকরণ

মুরগির মাংস 500 গ্রাম
পিঁয়াজ 2 টো (মাঝারি সাইজের)
রসুন 7-8 টা
আদা পরিমান মতো,
লঙ্কা 4 টে
ক্যাপসিকাম 1টা
টমেটো 1টা
আদা রসুন বাটা
টমেটো সস 3 চামচ
সোয়া সস 3 চামচ
চিলি সস 3 চামচ
সাদা তেল
নুন স্বাদ অনুসারে
চিনি
কর্ন ফ্লাওয়ার/ ময়দা
কালো মরিচ গুড়ো
ধনেপাতা
লেবু / ভিনিগার
মধু
ভাজা সাদা তিল

ম্যারিনেট:

মাংসটা ভালো করে পরিষ্কার করে অল্প নুন, অল্প কালো মরিচ ,1 চামচ টমেটো সস আর 1 চামচ চিলি সস,অর্ধেক চামচ আদা-রসুন বাটা আর অর্ধেক লেবু বা 1-2 ছিপি ভিনিগার দিয়ে ভাল করে মেখে 1ঘণ্টার জন্য রেখে দিতে হবে।

চিলি চিকেন বানানোর পদ্ধতি:

1 ঘণ্টার জন্য ম্যারিনেশন করে রাখা মাংস টার মধ্যে কর্নফ্লাওয়ার বা ময়দা দিয়ে মেখে নিতে হবে। অপরদিকে একটা কড়াতে সাদা তেল গরম করতে হবে। তেল ভালো মতন গরম হয়ে যাওয়ার পর ম্যারিনেট করে কর্ন ফ্লাওয়ার বা ময়দা দিয়ে মেখে রাখা মাংস গুলো একটা একটা করে হালকা লাল রং হয়া অবধি ভালো করে ভেজে নিতে হবে মাঝারি আঁচে। তারপর একটা প্লেট এর ওপর ন্যাপকিন রেখে ভাজা মাংস গুলো তুলে নিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে মাংস গুলো যাতে বেশি ভাজা না হয়ে যায়। এরপর কড়াইতে থাকা তেলের মধ্যে রসুন কুচি গুলো দিয়ে ভালো করে ভেজে নিতে হবে হালকা গন্ধ বেরোনো অবধি। এরপর এক এক করে চৌকো করে কেটে নেওয়া পিঁয়াজ, ক্যাপসিকাম দিয়ে হালকা ভেজে নিতে হবে এবং লম্বা করে চিরে নেওয়া লঙ্কা গুলো আর কিছুটা আদা দিয়ে ভালো করে নারতে হবে। সব উপকরণ গুলো নরম হয়ে যাওয়ার পর সোয়া সস,টমেটো সস আর টমেটো পেস্টটা দিয়ে দিতে হবে। এর পর ভাজা মাংস গুলো দিয়ে হালকা হাতে ভালো করে নেড়ে নিয়ে, একটা বাটিতে 2 চামচ কর্নফ্লাওয়ার গুড়ো গুলে নিয়ে মিশ্রনটি মাংসের মধ্যে দিয়ে ভালো করে নেড়ে নিতে হবে। তারপর স্বাদ মতন নুন, সামান্য গোলমরিচ আর সামান্য একটু চিনি দিয়ে ভালো করে ফোটাতে হবে। যদি গ্রেভি টা খুব গাঢ় হয়ে যায় তাতে সামান্য একটু জল ঢেলে ফুটতে দিতে হবে। পুরো রান্নাটাই মাঝারি ফ্লেমে করতে হবে। একদম শেষে কিছুটা পরিমাণ ধনেপাতা ,অল্প একটু মধু আর ভাজা সাদা তিল ওপর দিয়ে ছড়িয়ে দিলেই তৈরি আমাদের চিলি চিকেন।

প্রণালী

বিটের চাটনি

ঝর্ণা সিনহা

উপকরণ

বিট - ২ টি
তেঁতুল - পরিমাণ মতো
চিনি - ৬ চামচ
পাঁচফোড়ন - ১/২ চামচ
সর্ষের তেল - ১ চামচ
জল - পরিমাণ মতো
লবণ - ১/২ চামচ

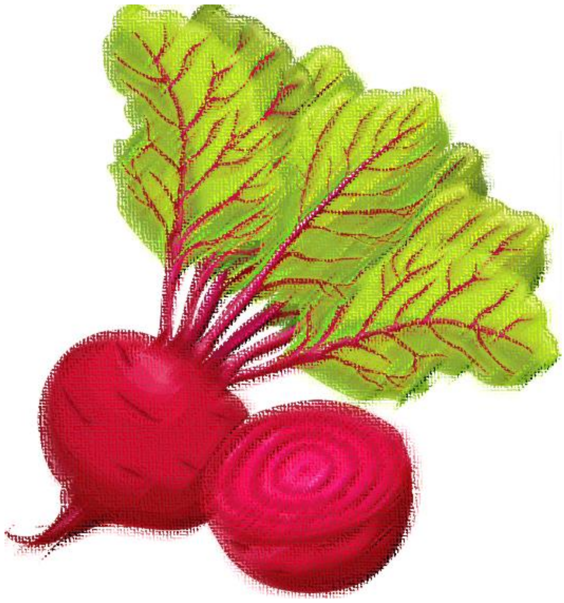

পদ্ধতি:

1. প্রথমে বিটের খোসা ছাড়িয়ে দু'টুকরো করে নিতে হবে। তারপর বিটগুলোকে খুব সরু সরু করে কেটে নিতে হবে।
2. এরপর কাটা বিট প্রেসার কুকারে ২টি সিটি দিয়ে সেদ্ধ করে নিতে হবে।
3. তেঁতুলকে একটু জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে।
4. বিট সিদ্ধ হয়ে গেলে একটি কড়াইয়ে ১ চামচ তেল গরম করে পাঁচফোড়ন দিতে হবে। এক মিনিট পর সেদ্ধ বিট দিয়ে কিছুক্ষণ নেড়ে নিতে হবে।
5. এরপর ভেজানো তেঁতুল এবং লবণ দিয়ে মিশ্রণটি কিছুক্ষণ ফুটাতে হবে।
6. শেষে চিনি দিয়ে আরেক মিনিট ফুটিয়ে নিন।
7. মিশ্রণটি ঘন হয়ে গেলে বিটের চাটনি তৈরি।

প্রবন্ধ

ব্যালকনি

সুচরিতা সেন চৌধুরী

প্রচন্ড কান্না পাচ্ছে শ্রুতির। নিজেকে সামলাতে পারছে না কিছুতেই। বুঝতে পারছে না কী ভাবে সব কিছু ঠিক করে দেওয়া যায়। এতটা অসহায় তো এর আগে কখনও লাগেনি। এতটা কান্না এর আগে পেলেও নিজেকে দারুণভাবে সামলেছে সে। পরিবারে, বন্ধু মহলে শ্রুতি ইজ আ স্ট্রং গার্ল। সেখান থেকে লেডি হয়ে উঠেছে অনেক আগেই। কিন্তু আজকের দিনটা বড্ড কঠিন। কিচ্ছুটি সামলাতে পারছে না। বার বার চোখটা জলে ভরে যাচ্ছে। কোনও রকমে লুকোচ্ছে। ওর লোকের সামনে কাঁদতে লজ্জা লাগে। না ঠিক লজ্জা না, কাঁদতে দেখলে যে অদ্ভুত অদ্ভুত স্বান্তনার শব্দগুলো উড়ে আসে ওগুলো ওর একদম হজম হয় না। জাস্ট নিতে পারে না। সেই স্বান্তনার ভয়ে ও কারও সামনে কাঁদতে পারে না। চেষ্টা করতে করতে একদিন অভ্যেসও হয়ে গিয়েছে। কান্না নিয়ন্ত্রণে রাখার বিষয়ে পিএইচডি করে ফেলেছে শ্রুতি। কিন্তু আজ কী হল!

উল্টোদিকের বাড়িটার সামনে ক্রমশ জটলা বাড়ছে। একটার পর একটা গাড়ি এসে দাঁড়াচ্ছে আবার চলেও যাচ্ছে। একটু আগে অ্যাম্বুলেন্স, পুলিশের ভ্যান এসেছিল। তারা নাকি আবার ফিরবে। এদিক ওদিকের বাড়ি থেকে উঁকি, ঝুঁকি, কানাঘুষো চলছেই। শ্রুতি শুধু তাকাতে পারছে না বাড়িটার দিকে। অনেকবার জোড় করে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়িয়ে ঘটনাটা মেনে নেওয়ার চেষ্টা করছিল কিন্তু পারছে না। ঘরে মা, বাবা, ভাই, বোন তো রয়েছেই তার মধ্যে এসে জুটেছে কাকা-কাকিমা। তাঁদের কৌতুহলের অন্ত নেই।

মা তো একবার জিজ্ঞেসই করে বসল, ''দেখেছিস ছেলেটাকে কখনও? আমার তো মনে পড়ছে না।' '

পাস থেকে কাকিমার মন্তব্য, ''কী করত রে ছেলেটা? হঠাৎ হলটা কী?''

কাকু বাজারে বেরিয়েছিল। রাস্তায় মানুষের আলোচনা শুনেছে। একজন বলছিল, রাতে ব্যালকনিতে কাউকে পায়চারী করতে দেখেছে। আর একজন বলেছে, রাতে নাকি খুব জোড়ে মিউজিক বাজতো। সেই মিউজিকের শব্দ শ্রুতিও শুনেছে। প্রায় রোজই রাতে খাওয়ার পর যখন বাড়ান্দায় কিছুক্ষণ হাঁটতো তখন উল্টোদিকের বাড়িটার রাস্তার দিকে বারান্দা লাগোয়া ঘরটা থেকে কখনও সেতার, কখনও গুলজার আবার কখনও মান্না দে ভেসে আসত।

এই সবগুলোই শ্রুতির খুব পছন্দের। সেই লোভেই ঠিক ডিনার সেরে নিয়ম করে একই সময়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াত শ্রুতি। সুনসান শান্ত শহরটাকে ওই গানের সুরে অন্যরকম লাগত ওর। ওই ঘরটায় হালকা একটা নীল আলো জ্বলতো। শ্রুতি ওর ব্যালকনির আলোটা বন্ধ করে রাখত। তাই ওকে কেউ দেখতে না পেলেও ও স্পষ্ট দেখতে পেত উল্টোদিকের ব্যালকনিতে বা ঘরে ছেলেটির চলাচল। দিনে কখনও তাঁকে দেখেনি ও।

বেশ কয়েক মাস হল সামনের ওই খালি বাড়িটার দোতলায় নতুন ভাড়াটে এসেছিল। না হলে ওই বাড়িটার দিকে তাকাতেই ভয় লাগত। কেমন একটা ভূতুরে লাগত। মাঝে মাঝে তো মনে হত কেউ চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। শ্রুতি প্রতিবারই ভেবে নিত হয়তো নতুন কোনও ভাড়াটে এসেছে বা কেউ কিনেছে। পরদিন সকালে জানা যেত কেউ আসেনি। এইবার প্রায় সকলেই বলল লোকজন এসেছে এই বাড়িতে।

রাস্তায় যে গুঞ্জন চলছে সেটা ঘরের ভিতরেও টের পাচ্ছে ও। আর এটাই ওকে আরও কষ্ট দিচ্ছে। বেরতে পারছে না কিছুতেই। প্রতিদিন রাতে বাড়ান্দাটা টানত শ্রুতিকে। শ্রুতির মনে হত, ওর অন্ধকার বাড়ান্দায় ওকে কেউ দেখতে পায় না। উল্টোদিকের বারান্দা থেকে ভেসে আসা গান শুনত ও, গুনগুন করত। তার একটা সময় ঘুম পেলে ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ত। তখনও কানে ভেসে আসত হালকা গানের শব্দ। এখন হঠাৎ ওর মনে হয়, এই পুরো বিষয়টা নিয়ে ও কখনও কারও সঙ্গে আলোচনা করেনি। বিষয়টা যে সচেতনভাবে করেনি এমন নয় কিন্তু।

এখনও ওই বাড়ির বাড়ান্দায় অনেক লোক হেঁটে বেড়াচ্ছে। মনে হয় ছেলেটির পরিবারের লোকজন। এই গোটা পাড়া কখনও দেখেনি তাকে। ভাই নিচ থেকে এসে বলল, পাড়ার সবাই বলাবলি করছে কেউ নাকি ছেলেটিকে কখনও দেখেনি। বাবা শুনে বললেন, ''সত্যিই তো আমরাও তো কখনও দেখিনি।' ' বলেই বাবা শ্রুতির দিকে কৌতুহলী চোখ নিয়ে তাকাল। প্রশ্নটা কী আসবে বুঝতে পারে শ্রুতি। নিজেকে প্রস্তুত করে। তখনই কলিংবেলটা বেজে ওঠে।

পাড়া কমিটির চেয়ারম্যান এসেছেন বাবার কাছে, ''শুনেছেন সেনবাবু, কী কাণ্ড। আমাদের পাড়ায় এমন ঘটনা ঘটবে কখনও ভাবিনি।' ' কথাটা কানে আসতেই শোনার চেষ্টা করে শ্রুতি। ''ব্যানার্জীরা এই বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল ২০ বছরের বেশি সময় হবে। কোথায় থাকে এখন কে জানে! ওদের একমাত্র সম্বল ছেলেটা নিরুদ্দেশ হতেই ওদের জীবনটা একদম বদলে গেল। ব্যানার্জীবাবু আফসোস করে বলতেন কেন যে ছেলেটাকে একা রেখে দেশের বাড়িতে বেড়াতে গেলাম? ফিরে এসে আর দেখলাম না। এভাবে কেউ উধাও হয়ে যেতে পারে, বলুন তো? ও নিশ্চই কোথাও আছে, একদিন ঠিক ফিরে আসবে। অনেক বছর সেই অপেক্ষাতেই ছিলেন। এখনও হয়তো কোথাও বৃদ্ধ দম্পতি একমাত্র ছেলের অপেক্ষায় আছে। এই বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার পর আর এই পাড়াতে আসেননি ওরা কখনও। এখন যা করে দালালই। বিক্রি করারও চেষ্টা করেছিল হয়নি। ভাড়াও হয়নি। একটা সময় এই বাড়িটার দিকে নজর ছিল প্রোমোটারদের। তবে উনি রাজি হননি,'' বলেই চলেন চেয়ারম্যান কাকু।

দূর থেকে পুলিশের গাড়ির সাইরেনটা আবার কানে আসে শ্রুতির, নাকি অ্যাম্বুলেন্স। ওর ঘরটাও ব্যালকনির সঙ্গেই। জানলা-দরজা বন্ধ করেও শব্দটা আটকাতে পারে না শ্রুতি। বাড়ির সবাই ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে। লোকজনের মধ্যে গুঞ্জনটা এতটাই বেড়ে গিয়েছে যে বন্ধ ঘরে বসেও শুনতে পাচ্ছে ও। কোনও রকমে বাইরে এসে দাঁড়ায় শ্রুতি। সাদা কাপড়ে ঢাকা স্ট্রেচারটা বের করে আনছে দুটো লোক।

বিকেল হলেই ধুলো ঝড়টা ওঠে প্রতিদিন এই সময়। অ্যাম্বুলেন্সে উঠছে সাদা কাপড়ে ঢাকা স্ট্রেচারটা। আর তখনই হাওয়ায় উড়ে যায় কাপড়ের একটা অংশ। চমকে ওঠে শ্রুতি। এটা কে? যারা আগ্রহ নিয়ে ছেলেটিকে দেখার জন্য অপেক্ষা করছিল রীতিমতো ছিটকে যায় এদিক ওদিক। কারও গলায় আর্তনাদ, কারও গলায় আতঙ্কের আওয়াজ শ্রুতির কান পর্যন্ত পৌঁছয় না। ''পোস্টমর্টেম হবে,'' বাবার গলা শুনতে পায়।

রাতের ব্যালকনিতে এই বসে থাকত! ঘরে গান এই চালাত! মেলাতে পারছে না শ্রুতি। কীভাবে সম্ভব? কোনও হিসেব মিলছে না। অ্যাম্বুলেন্সটা ভিড় ঠেলে সাইরেন বাজাতে বাজাতে মিশে যায় রাস্তার শেষ বাঁকটায়। পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকে শ্রুতি। আসতে আসতে বাড়িটার সামনের ভিড়টাও খালি হয়ে যায়।

সন্ধে পেরিয়ে রাত হয়, প্রান পাওয়া বাড়িটা আবার কেমন ভূতুরে হয়ে ওঠে শ্রুতির জন্য। মান্না দে-র গলাটা কোথা থেকে যেন ভেসে আসতে থাকে। ঘর থেকে হুরমুরিয়ে ব্যালকনিতে বেরিয়ে আসে শ্রুতি। না কোথাও তো গান হচ্ছে না। বাড়িটার দিকে তাকাতে পারে না ও। ভয় করছে খুব। মনে হয় উল্টোদিকের বাড়ান্দায় কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। সব সাহস জোগার করে তাকায় শ্রুতি, না কেউ নেই তো। সব ভ্রম। সারারাত ঘুমোতে পারে না, কখনও সেতার, কখনও মান্না তো কখনও গুলজার বাজতে থাকে ওর কানে। একদিন রাতে খেতে বসে বাবা বলেন, এই বাড়িটা বিক্রি করে একটা ফ্ল্যাট দেখে চলে গেলে কেমন হয়? বয়স হচ্ছে, এত বড় বাড়ি সামলানো মুশকিল। শ্রুতি বুঝতে পারে, কারণটা অন্য। অনেক প্রশ্ন মনের মধ্যে ভিড় করে আসছে। উত্তর খুঁজতে থাকে শ্রুতি। কোনও উত্তর পায় না। কত কিছু এই বিশ্বে ঘটে যার কোনও উত্তর থাকে না।

বেশ কয়েকদিন কেটে গিয়েছে, এই ঘটনার। এলাকা ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে উঠছে। ওই বাড়ি আপাতত সিল করে দিয়েছে পুলিশ। তার মধ্যে পুজোও এসে গিয়েছে। অনেক আলো চারদিকে, পাড়ার প্যান্ডালও তৈরি। এখন তো মহালয়া থেকেই পুজো শুরু। তবে এই পাড়ায় ষষ্ঠীর আগে বোধন হয় না। রাত পোহালেই ষষ্ঠী, সাজ সাজ রব চারদিকে। অনেক রাত পর্যন্ত প্যান্ডালেই ছিল ওরা। ভোরেই বোধনের পুজো। প্রায় মধ্যরাতে বাড়ি ফেরে পাড়ার সবাই, অনেকে থেকে যায় প্যান্ডালেই। ফেরার সময় শ্রুতির চোখ যায় বাড়িটার দিকে। মনে হয় আলো জ্বলছে। থমকে দাঁড়িয়ে বাবার হাতটা টেনে ধরে শ্রুতি।

' 'দেখো বাবা ওই বাড়িটায় আলো জ্বলছে এত রাতে। কেউ এসেছে থাকতে?'' মিস্টার সেন কিছুটা থমকে যায় মেয়ের প্রশ্নে। কী বলবেন বুঝতে পারেন না। আবারও প্রশ্ন করে শ্রুতি, ''জানা গেল কে ছিল? কোথায় বাড়ি? এখানে কেন এসেছিল? পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এল?'' মিস্টার সেন বলেন, ''বাড়ি চল সব বলছি।' '

মিস্টার সেন বলতে শুরু করেন, ''এই বাড়িটা বেশ কয়েকমাস হল প্রোমোটারকে দেওয়া হয়েছে শেষ পর্যন্ত। কেউই জানত না এলাকার। এটা ভেঙে এখানে নাকি একটা ফ্ল্যাট হবে। সেই ভাঙার কাজই চলছিল। সেদিন ছাদের ঘরটা ভাঙার কাজ চলছিল। সেই সময় একটা দেওয়ালের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে এই কঙ্কাল। পোস্টমর্টেম এবং যাবতীয় পরীক্ষার পর জানা গিয়েছে এই সেই ২০ বছর আগে হারিয়ে যাওয়া ব্যানার্জীবাবুর ছেলে। গোটা দুনিয়ায় যাকে খুঁজছিল ওর বাবা-মা, সে বন্দি ছিল এই বাড়িতেই, এতগুলো বছর ধরে। কেন, কী হয়েছিল, কী বৃত্তান্ত কেউ জানে না। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। ২০ বছর আগের ঘটনা, এখন তদন্ত করে কী পাবে বলা মুশকিল। ছেলেটির বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন এসেছেন ওর শ্রাদ্ধকাজ

করতে, তাই আলো জ্বলছে। কাল কাজের পর ওরা ফিরে যাবে, তার পর আবার পুলিশের অনুমতি পেলে বাড়ি ভাঙার কাজ শুরু হবে বলে শুনলাম।' '

ভোরের আলো ফুটছে একটু একটু করে। বোধনের প্রস্তুতি সারা। মাইকে চলছে মন্ত্রপাঠ। বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্যান্ডালের দিকে যায় শ্রুতি। আজ ও শাড়ি পরেছে। আজ অফিস হয়ে ছুটি। শাড়ি পরেই অফিস যাবে। অফিস থেকে ফোন করে সবাই ওকে বলেছে আজ যেন শাড়ি পরে অফিস যায়। গত কয়েকদিন অদ্ভুত একটা আতঙ্কে বাড়ি থেকে বেরতে পারেনি। শরত সকালের হাওয়া গায়ে এসে লাগে। বাড়িটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। আজ আর ভয় করছে না। কষ্ট হচ্ছে পুত্রহারা ওই দুটো মানুষের জন্য। ২০টা বছর ধরে যে আশায় বেঁচে ছিলেন আজ তাও শেষ। এবার তাদের বাঁচিয়ে রাখবে একটাই প্রশ্ন, কী হল তাদের একমাত্র ছেলের সঙ্গে? প্রশ্ন থেকে গেল শ্রুতির মনেও, যার উত্তর কখনও কারও কাছে চাইতে পারবে না। শুধু এই ক' মাসের অভিজ্ঞতার কথা ওই বৃদ্ধ বাবা-মার সঙ্গে শেয়ার করতে চায় ও। কুয়াশার পর্দা সরিয়ে সকালের আলো ছড়িয়ে পড়েছে শ্রুতিদের পাড়ায়। হাওয়ায় একটা শীত শীত ভাব। শাড়ির আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে নেয়। বোধন পুজোর অঞ্জলি শেষ। প্যান্ডাল থেকে বেরিয়ে নিজের বাড়িতে না গিয়ে উল্টোদিকের গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় শ্রুতি। তখনই হাতের ফোনটা বেজে ওঠে। বাবা। পিছন ফিরে দেখে ওর প্রিয় বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন মিস্টার সেন।

Anwesha

প্রবন্ধ

দুটো দিন ও দু' শো টাকা

উজ্জ্বল

সাজিদ খান আসতেই আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম। শহর থেকে বেরোনোর আগে সকালে অটোয় তেল ভরার সময় টাকা চেয়েছিলেন। দু' শো টাকা দিয়েছিল উড়ান। তার পর সারা দিন ঘুরে, আশ্চর্য সব দৃশ্যাবলি চোখে নিয়ে সন্ধ্যায় হোটেলে ফেরা। অটো থেকে নামার পর সাজিদকে বাকি টাকা দিয়ে উড়ান বলে, ''সাজিদ ভাই, বিশাখ আপনাকে বলেছিল, আমরা খুশি হলে আপনাকে সাড়ে তিনশোই দেওয়া হবে। আমরা সত্যিই ভীষণ ভীষণ খুশি। এই নিন পুরো সাড়ে তিনশো।' '

সকালে তেল ভরার সময় সকলের সামনে টাকা দিলেও সন্ধ্যায় আমরা আর কেউই সে কথা মনে রাখতে পারেনি। ফলে সকালের দু' শো ধরলে সাজিদকে দেওয়া হয়েছে মোট সাড়ে পাঁচশো। হোটেলের ঘরে ঢুকেই উড়ানের টনক নড়ে। কাউকে কিছু না বলে ও হনহন করে নীচে নামে। এবং হতাশ হয়ে উপরে উঠে এসে বলে, ''নেই! চলে গেছে!''

আমরা তিন জন প্রভূত অবাক, নেই মানে! কে?

–অটোওয়ালা। এ বার আমার দিকে তাকিয়ে, ''তোর সাজিদভাই।' '

আমি বলি, ''কেন? থাকবে কেন? ওর তো চলে যাওয়ারই কথা। আবার রাতে আসবে।' '

কিন্তু কে শোনে কার কথা! পরে জেনেছি, দু' শো টাকা বেশি দেওয়ার কথা। জেনেছি, বন্ধুদের মনোভাব। ওদের মনে হচ্ছে গতকাল দুপুর থেকে অটোচালকদের সঙ্গে অতশত কথাবার্তা, সব দর কষাকষি শেষ অবধি ব্যর্থ! বৃথাই তিনশো পঁচিশে নামানো! মিথ্যে সমস্ত জেতার আনন্দ; সাড়ে পাঁচশো, পাঁচশো, সাড়ে চারশো, চার, কমাতে কমাতে...। তাই এখন হেরে যাওয়ার আফসোস। কিন্তু আদৌ কি একে হেরে যাওয়া বলা যায়!

দু' দিন আগে আমরা চার জন পৌঁছেছি অওরঙ্গবাদ শহরে। বেড়াতে। হোটেলের ভেতর বেশ কয়েক জন অটোওয়ালার সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে। বোঝা গিয়েছে, সারা দিন ঘোরার জন্য পাঁচশো থেকে সাড়ে পাঁচশো টাকা লাগবে। তার কমে কোনও ভাবেই সম্ভব নয়। ঘোরানোর তালিকায় দৌলতাবাদ দুর্গ, ইলোরা, অওরঙ্গজেবের সমাধি, বিবি কা মকবরা...। অথচ একই জায়গার জন্য একমাত্র সাজিদ খানই চারশো টাকা চেয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও দরাদরি করেছিলাম। আরও কম, আরও কম কী ভাবে পাওয়া যায়, সবাই ছিলাম সেই নেশাতেই। শেষ পর্যন্ত রফা হয়েছিল তিনশো পঁচিশ টাকায়। উনি প্রথমে চারশো, পরে কমিয়ে সাড়ে তিনশো চেয়েছিলেন। তখন বিশাখ বলেছিল, ''দেখুন, আপনার সঙ্গে কথা রইল তিনশো পঁচিশের। যদি কাল ঘোরার পর আমরা আনন্দ পাই, তবে আপনাকে বলতে হবে না, পুরোটাই পাবেন।' ' তার পর ওঁর হাতে হোটেলের কার্ডে রুম নম্বর লিখে ধরিয়ে দিয়েছিল।

টাকা প্রসঙ্গে এর পর তিনি চুপচাপ ছিলেন। হাতলের হ্যাঁচকা টানে স্টার্ট দিয়েছিলেন অটো। ''কাল সকাল ন ' টায় তাহলে,''—বলে, সামান্য এগিয়েও থেমে গিয়েছিলেন। মুখ বাড়িয়ে বলেছিলেন, ''গাড়ির নম্বর খেয়াল রাখবেন, একুশ চুয়াল্লিশ।' ' তার পর সন্ধের নিরালা বাজারের ব্যস্ত রাস্তায় মিশে গিয়েছিল তাঁর কালো হলুদ অটোরিকশা।

সাজিদ খান। এমএইচসি একুশ চুয়াল্লিশ নম্বরের অটোরিকশার ভাড়াটে চালক। গতকাল সন্ধ্যে হাঁটতে হাঁটতে আমরা তখন ক্লান্ত। অওরঙ্গাবাদ শহর দেখার ইচ্ছে নিয়ে উঠে পড়েছিলাম তাঁর অটোরিকশায়। তার পর মিটার নামিয়ে, ছুট। তখনই প্রশ্ন করেছিলাম। ''ভাই আপকা নাম ক্যায়া হ্যায়?'' তার পর প্রসঙ্গ ও প্রশ্ন পালটে পালটে শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়েছিল ওঁর সঙ্গেই আগামী কাল পুরো দিন ঘুরব। ইতিহাসের নানান পাতায়।

তাই ছুটেছি আজ সারা দিন। ওঁর অটোরিকশায়। সকাল ন' টায় আসবে বলেছিলেন। কিন্তু সে সময় পেরিয়ে তিনি এসেছিলেন প্রায় পৌনে দশটায়। অগ্রিম কোনও টাকা পয়সা ছাড়া শুধু মুখের কথাতেই চুক্তি। তা সত্ত্বেও আসতে যে পঁয়তাল্লিশ মিনিট দেরি হবে সে খবর সকাল ন' টাতেই জানিয়ে দিয়েছিলেন হোটেলে ফোন করে। আমরা নিশ্চিন্ত। নতুন করে আবার অটো ঠিক করতে হবে না। তিনশো পঁচিশেরটাই আসবে। একটু দেরি হবে, কিছুটা বিরক্তি-ও, তবু ঠিক আছে। হোটেলের সামনে অপেক্ষা করতে করতে ন' টা পঁয়তাল্লিশের আগেই দেখতে পেয়েছিলাম একুশ চুয়াল্লিশকে। আর সে সময় থেকেই সকলের মনে

সাজিদ সম্পর্কে একটা ভাল ধারণা হয়েছিল। আসলে নির্দিষ্ট সময়ে আসতে না পারার ফোনটা একটু অন্য রকম লেগেছিল আর কী! ভিন রাজ্যের অচেনা জেলা শহর, তার চেয়েও অজানা সাজিদ খান, কিন্তু দেওয়া কথা রাখার ব্যাপারে এতটা পারফেক্ট!

আর এখন রাত প্রায় বারোটায় সেই একই মানুষ সম্পর্কে আমাদের মনে সংশয়। নিজেদের মধ্যে চলছে সওয়াল জবাব। সওয়াল অর্থে সন্দেহ, সংশয়, খুঁতখুতানি এবং সর্বোপরি অবিশ্বাস। সে পক্ষে উড়ান ও মিঠাম। প্রতিপক্ষে আমি আর বিশাখ। ওদের কোনও শানিত যুক্তি নেই। পাশাপাশি আমাদের মতকেও প্রতিষ্ঠিত করতে পারছিল না সারা দিনের কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সাজিদ খান এখনও আসেননি যে! অথচ কথা ছিল বারোটার বেশ কিছুটা আগে তিনি আবার আসবেন। এগারোটায় পৌঁছনো আপ ট্রেনের যাত্রী দেখে।

ট্রেন ধরার উত্তেজনা, সাজিদ খানের জন্য অপেক্ষা, অধৈর্য ও বিরক্তি সব মিলিয়ে ভয়ানক অবস্থা। তার সঙ্গে রয়েছে মালপত্রের গোছগাছ। সারা দিনের সমস্ত ইতিহাস ও শিল্প দেখার অনুভূতি কাটতে কাটতে কতটুকু যে হয়ে গেল! ঘড়ি এখন তারিখ পাল্টানোর রেখা স্পর্শ করবে। আমাদের অস্থিরতা বাড়ার কথা। ধীরে ধীরে তা চড়বে। এমনই ঘটা উচিত্ ছিল। অথচ বাস্তবে সেটা শুরু হয়েছে সাজিদ খান আমাদের হোটেলে নামিয়ে দিয়ে যাওয়ার পর পরই। তখন ক' টা হবে? এই সাড়ে আটটা মতো।

–পুলিশে একটা ফোন করলে হয় না?

মিঠামের কথা শেষ হওয়ার আগেই বিশাখ ওকে প্রায় গিলে ফেলল, ''ছিঃ, মিঠাম ছিঃ! সামান্য দু' শো টাকার জন্য পুলিশ ডাকবি! তা-ও বুঝতাম যদি লোকটা টাকা লুকিয়ে বা জোর করে নিত! আমরাই তো ভুল করে দিয়ে দিয়েছি।' '

–তুই তো দু' শো দেখছিস। সারা দিন ওর পেছনে কত খরচ হয়েছে সে খেয়াল আছে তোর?

কতই বা খরচ হয়েছে? সব যোগ করলে গোটা পঞ্চাশেক টাকা! তা-ও সাজিদ খান সেটাও আমাদের করাতে চাননি। ইলোরাতে ঢোকার আগে আমি বলেছিলাম, দুপুরের খাওয়াটা সেরেই কিন্তু ইলোরা দেখব সাজিদ ভাই। ভাল কোনও রেস্তোরাঁ দেখে দাঁড়াবেন।

চড়াইয়ের ঠিক আগে বাঁ দিকে রাস্তার গা ঘেঁষে নানা খাবার দাবার নিয়ে ভরপুর এক ধাবায় থেমে গিয়েছিলাম। চোখে মুখে জল ছিটিয়ে, হাত ধুয়ে, একই টেবিলে চার জনে বসে পড়েছিলাম। ডাল ফ্রাই, কষা মুরগি আর প্লেন রাইস। দু' এক গাল খাওয়াও হয়ে গিয়েছে তখন।

' 'হ্যাঁরে ও খাবে না?'' উড়ানের প্রশ্নে দেখি সাজিদ খান অটোয় বসে লুকিং গ্লাসের সামনে মুখটাকে বিভিন্ন ভঙ্গিতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছেন। দৌলতাবাদ দুর্গের মাথা ছোঁব বলে পাহাড় বেয়ে ওঠা ও নামার সঙ্গে সঙ্গে খিদেটাও বেড়ে গিয়েছিল। সকালে সে রকম ভারী খাবার খাওয়াও হয়নি। কাজেই রেস্তোরাঁয় ঢুকে সাজিদ খানের কথা আর মাথায় ছিল না। অর্ডার দেওয়া মাত্র টেবিলে খাবার হাজির। তর সওয়ার সময় দিইনি। ঝটপট খাওয়া শুরু করেছিলাম।

উড়ান ডাকে, ''সাজিদ ভাই! সাজিদ ভাই!''

অটোরিকশা ছেড়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে, চিরুনিটাকে পেছনের পকেটে গুঁজে, অন্যান্য চেয়ার টেবিলকে পাশ কাটিয়ে এক্কেবারে সামনে হাজির হলেন। খাকি উর্দির সাজিদ খানের চোখে মুখে জিজ্ঞাসা, কী হয়েছে? যেন রেস্তোরাঁ বা খাবার সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ জানাব আমরা ওকে।

আপনি খাবেন না? আমি জিজ্ঞাসা করি।

লাজুক একটা হাসি ওঁর মুখে। কোনও শব্দ নেই। সকাল থেকেই লক্ষ করেছি, উনি খুব চুপচাপ। অথচ সমস্ত বিষয়েই আন্তরিক বিনয়। সঙ্গে হাসি।

বসুন। কী খাবেন? বলে, বিশাখ খাবার পরিবেশনকারীদের এক জনকে ডাকে। সাজিদ খান বেসিনের দিকে এগোলেন। ফিরে এসে একটু দূরের টেবিলে বসলেন। খাবার সেখানে পৌঁছল। সম্ভবত রুটি। বেশ চটপট সেসব চালান করছেন মুখে। না ডেকে নিলে ওঁর হয়ত এ বেলা খাওয়াই হত না! চার চার জন খরিদ্দার এনে দেওয়ার বকশিস হিসেবে ইচ্ছে করলেই বিনে পয়সায় খেতে পারতেন। প্রায় সব বেড়ানোর জায়গাতেই এই নিয়ম। এখানেও যে আছে সে কথা সাজিদ খান কথায় কথায় বলেছিলেন। রেস্তোরাঁর বিল মেটানোর সময় জেনেছিলাম, উনি পাঁচটি রুটি আর এক প্লেট মিক্সড় সবজি খেয়েছেন। সব মিলিয়ে বাইশ টাকা।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে মিঠাম ওঁকে ধরেছিল, আপনি খিদে পেটে আরাম করে চুল আঁচড়াচ্ছিলেন! অদ্ভুত তো! খেতে গেলেন না কেন? খিদে পায় না? নাকি আমাদের ডাকের অপেক্ষায় ছিলেন?

খুব বিনয়ের সঙ্গে উত্তর এসেছিল: আসলে তেল ভরে মোটে চল্লিশ টাকা ছিল। খেয়ে ফেললে তারপর? গাড়ির কিছু হলে? ধরুন যদি পাংচার...

শেষ করতে না দিয়ে বিশাখ বলে, আমরা থাকতে আপনি টাকা দেবেন কেন? যতই হোক আজ আপনি আমাদের টিমে গেস্ট। আমরাই তো খাওয়াব।

আবার মিঠাম কথা কেড়ে নিয়েছিল, কাছে বেশি পয়সা রাখেন না কেন? আর আপনিই তো বলেছিলেন কাস্টমারের বদলিতে খাবার ব্যবস্থা আছে এখানে!

সাজিদ খানের চোখ এই বাক্যের পর উইন্ড স্ক্রিন থেকে সরে সোজা মিঠামের মুখে এসে পড়ে। অটোরিকশার গতিও কি কিছুটা কমে এল! হয়ত মনোসংযোগে ছেদ ঘটেছে। মিঠাম এত্ত ঠোঁট কাটা না! ভাল্লাগে না।

সাজিদ উত্তরে বলেছিলেন, 'খাওয়া নিয়ে আমার অত মাথা ব্যথা নেই... দিন আনা দিন খাই। দুপুরে এ রকম না খাওয়া তো নতুন নয়। আর আপনাদের এখানে এনেছি তার বদলে খাওয়ার কথা বলছেন? আমার ওসব ভাল লাগে না। নিজেকে ছোট লাগে। আল্লার কৃপায় পেটের যোগান হয়েই যায়। সে যে ভাবেই হোক। লোকের চোখে ছোট হয়ে বেঁচে থাকা তো আসলে বাঁচা নয়।' মিঠামের থোঁতা মুখ পুরো ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল।

লোকটি শিক্ষিত নয়, অথচ জীবনদর্শনে কোনও ঘাটতি নেই! সাজিদ খানের সেই ভাবনা তখন খুশি করেছিল। আর এখন, এত সহজে ওরা সে সব কথা ভুলে গেল! শুধু ভুলে গেলেও ঠিক ছিল। কিন্তু, এ সব কী! মানুষকে দু' মুঠো খাইয়ে এমন অপমান করবার অধিকার জন্মায়! আর, ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে, অওরঙ্গজেবের সমাধি চত্বরের সামনে দুটো পেয়ারা আর কমলা লেবু, পানিচাক্কিতে বাদাম ও পাঁপড়, আর বিবি কা মকবরা অর্থাত্ অওরঙ্গজেবের স্ত্রীর সমাধিস্থলে যাওয়ার পথে, না সে সময় তো তিনি চা বিস্কুট খাননি, শুধু আমরা খেয়েছি। তবে তো পঞ্চাশ টাকাও পুরল না। তার জন্য এমন ঠেস মেরে কথা বলতে হচ্ছে! ছিঃ।

বিশাখ বাইরে গিয়ে একটু দেখ না! উড়ানের আবেদন শুনে মনে হয় কোথাও একটু ভরসা রয়ে গেছে। বারোটা দশ বাজে। এ রকম সময়েই ওঁর আসার কথা। আর দেখে লাভ কী! মিঠাম বলল, আসার হলে অনেকক্ষণ আগেই আসত। তোরা একবারও ভেবে দেখলি না, একটা অতি নিম্নবিত্ত লোক, যার ডেইলি ইনকামের থেকেও বেশ কিছু বেশি টাকা পেয়ে গেছে, তার ফেরত আসার দরকার কী! বরং একদিন রেস্ট নিলে পরদিন দ্বিগুণ উত্সাহে কাজ করতে পারবে। আর সবচেয়ে বড় কথা লোকটা ভুলভাল জাতের। আমি এ সমস্ত ক্রিমিনালদের চিনি। যত্তসব! ওর হাসি দেখেই বুঝেছিলাম। এই শহরে আমরা তো আর কোনওদিনই আসব না। ফলে ওকে খুঁজে পাওয়ার কোনও সম্ভাবনাও নেই। টাকা দেওয়ার কোনও ফ্যাচাং থাকল না। শালারা সব পারে। এখন তো ভাবছি ভাগ্যিস অটোটাকে নিয়ে খাদে ফেলে দেয়নি! এ যাত্রায় জীবনটা তাই থেকে গেল। নইলে...

মাথায় আগুন জ্বলে গেল। এতক্ষণ যা বলছিল তা অনিচ্ছে সত্ত্বেও হয়ত সহ্য করা যায়, কিন্তু অপমানের পাশাপাশি লোকটির ধর্মে আঘাত, সহ্য করা যায় না। শোন মিঠাম, আর একটিও শব্দ নয়। একবারের জন্যও আর সাজিদ খানের নাম উচ্চারণ করবি না। ওকে দেওয়া দু' শো টাকা তো তুই লস্ হিসেবে দেখছিস! ঠিক আছে, ওটা আমার ভাগে ঢুকিয়ে দিবি। আমি দিয়ে দেব। প্লিজ় আর কোনও কথা নয়। সব কিছুর একটা লিমিট থাকে। ইউ হ্যাভ ক্রস্‌ড দ্যাট লিমিট।

পরিস্থিতি কি ভারী হয়ে গেল? যদি হয়ও বা, সেটাই এই মুহূর্তে প্রয়োজনীয় ছিল। ওর বাবার সঙ্গে কে কবে কী ব্যবহার করেছে তার জন্য গোটা সম্প্রদায়ের মানুষ দোষী হয়ে পড়বে? আর সংলাপের আদান প্রদান ধাপ থেকে ধাপ পেরিয়ে যেভাবে ওপরে উঠছিল, তাকে থামানো জরুরিই ছিল। লোকটি সত্যিই নিম্নবিত্তের। দিন আনা দিন খায়। একুশ চুয়াল্লিশ নম্বরের অটোরিকশা তাঁর নিজের নয়। দিন চুক্তিতে ভাড়া নেওয়া। দিন শেষে মালিকের ভাড়া, পেট্রোল, অন্যান্য টুকিটাকি, নিজের খুচরো খাওয়া এ সব বাদ দিলে হাতে থাকে গড়ে একশো থেকে টেনেটুনে একশো তিরিশ। কদাচিত্ দেড়শো। সকাল ন' টা বা দশটা থেকে রাতের আপ ট্রেনের প্যাসেঞ্জার দেখে বারোটা নাগাদ বাড়ি ফেরা। মাঝে মধ্যে বাড়ির পথে যদি কোনও ভাড়া হয় তবে এক ঝলক বাবলু খানকে দেখতে ঘরে ঢুকে পড়া। তিন মেয়ের পর একমাত্র সাড়ে তিন বছরের 'বেটা' । দিন রাতের খাটুনির ফাঁকে তাকে তো দেখতে চাইবেই বাবার উপোসি চোখ। আর সেইটুকুই যা ঘরে থাকা। রাতে শুধু শোওয়ার জন্য যাওয়া। সারাদিন কতবার বাবলু খানের কথা আমরা শুনেছি! যতক্ষণ অটোরিকশায়, ততক্ষণ সাজিদ খানের সঙ্গে আলাপে আমি মগ্ন ছিলাম। তাই উড়ান 'তোর সাজিদ ভাই' বলে ঠুকল।

এলোরায় যখন ঘুরছি, সাত্যকিদা মোবাইলে ফোন করেছিল। মাঝে মাঝে ফোন করে আমাদের ঘোরার খবর নেয়। কোথায় কী দেখছি, ইত্যাদি। মাস দুয়েক আগে সপরিবারে সমস্ত ঘুরে গেছে। ফোনে আমাদের কথা শুনতে শুনতে আরও একবার কল্পনায় চলে আসে এখানে। ঘুরে ফিরে বেড়ায় ইতিহাসের অনন্ত ধুলোরাশি উড়িয়ে। আজ দুপুরে আমরা কৈলাস মন্দিরে শুনে ও বলল: মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে ভাব যারা প্রথম সরঞ্জাম নিয়ে পাহাড়ে আঘাত করেছিল, তাদের কাছে কি ছিল আজকের এই শিল্পশালার ইঙ্গিত!

জানত কি তাদের পরবর্তী প্রজন্ম! হয়ত হালকা আভাস পেয়েছে তার পরের দল। তাহলে কী ভাবে একটা শিল্প বংশ পরম্পরায় খোদিত হয়েছে! নানা প্রতিকুলতা সত্ত্বেও জয় করেছে সমস্ত বাধা!

সাত্যকিদার এই কথা শোনার পর ওই অপরূপ এবং অবিশ্বাস্য ভাস্কর্য পাহাড়ের তীরে থমকে ছিলাম। অওরঙ্গাবাদে আসার আগে অজন্তা ঘুরে এসেছি। অজন্তার গুহাচিত্র, গুহা ভাস্কর্য দেখে স্নায়ু অবশ হয়েছে। এলোরার ভাস্কর্য আরও ব্যপক। এইসব দেখে মন ভরে ছিল। কিন্তু নির্মাণের এ রকম চর্চা মনেই আসেনি। সাত্যকিদা না ভাবালে সত্যিই মাথায় আসত না এ শিল্প আসলে বংশ পরম্পরার। ভাবনাটা ঘুরছিলই মাথায়। তাই কিছু পরে পাশে থাকা সাজিদ খানকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সাজিদ ভাই আপনারা অওরঙ্গাবাদে কতদিন আছেন? আপনার পূর্বপুরুষ কোথাকার?

আমরা বরাবর এখানকার। আগের সব নাম মনে নেই, সব যে জানি তাও নয়, তবে শুরু থেকে বাবলু খান পর্যন্ত সবাই এই মাটির। সাজিদ খান ছেলেকে বাবলু খান বলেন। কেন? বুঝিনি। হয়ত পুরো নাম উচ্চারণের মধ্যে একটা আত্মতৃপ্তির স্বাদ পান। 'এই মাটির' শব্দ দু' টি শুনে সাজিদ খানকে ওই ভাস্করদের একজন বলে ভাবতে ইচ্ছে করে। পাথর কাটার নৈপুণ্যে আদ্যপান্ত এক শিল্পী। পাহাড়ের গায়ে লেগে থাকা বাঁকপূর্ণ রাস্তায় সে পরম দক্ষতায় আমাদের নিয়ে কেটে কেটে চলে, হাতে শানিত খোদাই যন্ত্র, একুশ চুয়াল্লিশ। কাজেই এলোরার খোদাইকরদের উত্তরপুরুষকে যদি দু' শো টাকা দেওয়াই হয়, সে তো অনেক অনেক কম। কোনও মূল্যেই তো ওই আশ্চর্যের ন্যূনতম স্বীকৃতি হয় না। নিজেদের এই সামান্য হেরে যাওয়ায় সম্মান বোধ করা উচিত্। যেন শিল্পের সামনে নতজানু হওয়া। কোনও ভাবেই এতে পরাজয় হয় কি? ব্যাপারটাকে এইভাবে বা দেখা হচ্ছে কেন, সেটাও মাথায় আসছে না।

ওঁর রাতে ফেরত আসা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ ট্রেন ধরার জন্য অত রাতে অটোরিকশা পাওয়া দুরূহ । আগেভাগে বেরিয়ে অটোরিকশা খুঁজে আনাও হরিবল্! অথচ দেখছি আমি ছাড়া কেউই কিন্তু আসল সমস্যা নিয়ে চিন্তিত নয়। সবাই তাঁর টাকা নিয়ে কেটে পড়ার ভাবনাতে ডুবে। এটাই খারাপ লাগছে। অহেতুক একটি লোককে দোষারূপ করে আসল বিষয় থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। আরে বাবা, দু' শো টাকার কথা না হয় ভাবলাম। কিন্তু আজ রাতে ট্রেন যদি ধরতে না পারি তবে কী কী হতে পারে? এক, মানমাড় যাওয়া যাচ্ছে না। দুই, কাল সকালের ভাস্কো এক্সপ্রেস ধরা বাতিল; তিন, পরের সমস্ত ভ্রমণ সূচির রদবদল। প্রথম দুটোর জন্যই যে দু' শোর কত গুণিতকে টাকা নষ্ট হবে তার হিসেব করার মতো সময় বা স্থিতি এদের এখনও আসেনি। আমার বলতেও ভাল লাগছে না।

নীচে থেকে হঠাত্ই অটোরিকশার থেমে যাওয়ার নীরবতা এল। উদ্বীগ্ন উড়ান এক ঝটকায় জানলার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। আমরাও। মধ্য রাতের নাগরিক আলোয় ওপর থেকে দেখা যায় শুধু অটোরিকশার ছাদ। চালক অদৃশ্য। ঘোরতর উত্কন্ঠায় আমরা। শরীরের প্রতিটি কোণে অপেক্ষা। দৃশ্য দ্রুত বদলায়। দু ' জন যাত্রী নামে। রাতের অতিথি। এই হোটেলে। চালকের হাতের টুকরো অংশ দেখা গেল। বোধহয় ভাড়ার টাকা নিলেন। কিন্তু এতটা ওপর থেকে এই হালকা আলোয় হাতের ওইটুকুতে কাউকে চিনতে পারা অসম্ভব! ধৈর্য্য প্রায় হারিয়ে বিশাখ জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে ডাকে, সাজিদ ভাই! সাজিদ ভাই! দু' বারের পরও প্রত্যাশিত কোনও উত্তর নেই। অটোরিকশা যেদিক থেকে এসেছিল, মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল সে দিকেই।

না, আর অপেক্ষা নয়। বিশাখ, আমাদের বেরোতে হবে এবার। তুই বরং দুটো অটো খুঁজে নিয়ে আয় সামনের মোড় থেকে।

যাক, তাহলে এরা যাওয়ার কথাটা ভেবেছে। এখন বারোটা পঁয়ত্রিশ। আর দেরী করার মানে হয় না। ট্রেন দুটো পাঁচে। সঙ্গে এত লাগেজ। অটোরিকশা খুঁজে নিয়ে আসা, মালপত্র তোলা, হোটেলের সব হিসেব নিকেশ মিটে গেছে তবু চাবিটা তো দিতে হবে! এতটা সময় অপেক্ষা করার কোনও মানে ছিল কি? আমরা যাব মানমাড়। কাল, কাল কেন আজই তো, সকাল দশটায় ট্রেন সেখান থেকে, আমাদের রিজ়ার্ভেসান আছে গোয়ায় পৌঁছানোর নিজ়াম উদ দিন ভাস্কো এক্সপ্রেসে। গতকাল সন্ধেয় সাজিদ খানের অটোরিকশায় শহর ঘোরার পাশাপাশি মানমাড় যাওয়ার পুঙ্খানুপুঙ্খ নেওয়ার পর রাতে হোটেলে ফিরে ওঁর পরামর্শই বিবেচিত হয়েছিল। আজ সকালে ওঁকে সে কথা জানিয়েছিলাম দুর্গে ঢোকার আগে, আপনার কথা মতো আমরা দুটো পাঁচের প্যাসেঞ্জার ধরব। আপনিই কিন্তু পৌঁছে দেবেন।

জবাবের বদলে সেই হাসি ভেসেছিল মুখে। সারাদিনে আরও কয়েকবার মনে করিয়েছি। কখনও আমি, আবার উড়ান, বিশাখরাও। হাসি ছিল সম্মতিসূচক। কিন্তু শব্দ চাইছিলাম আমরা। শেষ পর্যন্ত পানিচাক্কি থেকে বেরোনোর সময় বলেছিলেন, এগারোটার ট্রেনের সওয়ারি দেখে বারোটার আগেই চলে আসব। আপনারা গুছিয়ে থাকবেন। একটু ঘুমিয়েও নিতে পারেন। আমি ডেকে তুলবখন। সেই কথাটাই মাথায়

বাজছে । কী আন্তরিক শুনিয়েছিল। ভিন রাজ্যের সামান্য পরিচিত একজন এই কথা বলতে পারে! সত্যিই আশ্চর্য লেগেছিল। ওঁর প্রতি বিশ্বাস বেড়েছে আরও। না, বিশ্বাস বাড়তে দেওয়া ঠিক নয়। অথচ অবিশ্বাস করার কোনও কারণ মনে আসেনি। ভেবেছিলাম অপরিচিত শহরে মধ্যরাতে মালপত্র সহ সাজিদ খানকে ভরসা করা যায়। দু' দিক থেকেই। সঙ্গত ভাড়া ও অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। সারাদিনের সাহচর্য সেটুকু শিখিয়েছে। লোকটি টাকা পয়সার বিষয়ে উচ্চাশাহীন! তা না হলে, সবাই যেখানে পাঁচশো সাড়ে পাঁচশো, সাজিদ খান সেখানে কেন তিনশো চেয়েছিলেন?

ধর্মের কারণেই তিনি যে অর্থ সংযত সে কথা জানিয়েছিলেন।-কোরানে ন্যায্য উপার্জনের উল্লেখ আছে। যতটা সংগত, ততটাই, তাতে হয়ত অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হয়, কিন্তু তৃপ্তি, অনেক। মনে পড়েছিল অওরঙ্গজেবের ধর্ম মানা বিলাসহীন জীবনের অংশ। এমনকী মৃত্যুর পরও। আর সেই অওরঙ্গজেবই তো আধুনিক অওরঙ্গাবাদের রূপকার। ফলে মিল থাকা স্বাভাবিক নয় কি? তবে আজকালকার দিনে কেউ যে সত্যিই এমন বোধের চর্চা করেন সেটা আমার কাছে অবিশ্বাস্য ঠেকেছিল। অথচ সত্যিই তাঁর টাকার একটু বেশিই প্রয়োজন। বাবলু খানের তিন বোনের বড়টির বয়স এবার পনেরো। এরই মধ্যে তার দু' দু' বার শাদি ভেস্তেছে। দু' বারই পাত্রপক্ষের কোনও দাবি দাওয়া ছিল না। কিন্তু সাজিদ পেরে ওঠেননি। হাজার দশেক টাকার প্রয়োজন ছিল। মহল্লাবাসীকে একটু আপ্যায়ন, বরযাত্রীদের সামান্য যত্নআত্তি, এ সবের জন্যই। বাড়ির প্রথম কাজ এত নির্লিপ্তভাবে হতে দিতে সায় দেয়নি বাবার মন। বাবলুর মায়েরও অমত ছিল। তাই পনেরোর শাহনাজ এখনও অবিবাহিত। পরের দু' জনের বিয়ে দেওয়ার তাড়াও সাজিদ অনুভব করেন। কিন্তু কোন দিক সামলাবেন! অনেকেই মালিককে ঠকিয়ে উপরি উপার্জন করে। সাজিদ জানেন সে সব কৌশল। কিন্তু সে কৌশল আর অবলম্বন করা হয়ে ওঠে না। ধর্মের বিরুদ্ধাচারণে ভয় প্রচণ্ড। যত না নিজের জন্য তার চেয়ে বেশি বাবলু খানের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে।

সারা দিনের এই সমস্ত আলাপ সালাপের টুকরো টাকরা রাত বারোটা পঁয়ত্রিশ পেরোনো সময়েও আমাকে আশাবাদী রেখেছে। সর্বক্ষণই মনে হচ্ছে সাজিদ খান আসবেন। আসতে ওঁকে হবেই। ধর্মের কারণে? নাকি শিল্পের কারণে? এই দন্দ্বই আমার মনে চলেছে। না আসার কোনও শঙ্কা এখনও তৈরি হয়নি। যে শিল্পময় শহরে সাজিদ জন্মেছেন, উত্তরাধীকার সূত্রে অবশ্যই যে শিল্পশালা নির্মাণের অংশিদার সাজিদ, তা কি কখনও তাঁকে শিল্পবিমুখ হতে পারে! সারাদিনে আমাদের সঙ্গে গড়ে ওঠা সম্পর্কও কি একটা শিল্প নয়! ওই হাসি, যা তিনি নীরব উপহার হিসেবে প্রতিটি মুহূর্তে পরিবেশন করেছেন! ওটাও তো শিল্প!

শুয়োরের বাচ্চা, ঘোরার আনন্দটাই মাটি করে দিল! এখন ট্রেন পেলে হয়! আর না পেলে, সোনায় সোহাগা, বলতে বলতে মিঠাম ঘটাং করে দরজা খুলে বেরিয়ে যায়। অটোরিকশা ডাকতে কি? আমিও মিঠামের পিছনে বেরোই। একা একা, এত রাতে, কোথায় যাচ্ছে? হোটেলের সিঁড়ি দিয়ে ওর পেছনে পেছনে নেমে যাওয়ার সময় আমার এই প্রথম সেই কথাটা মনে হল। সন্ধে থেকে একবারও যা মনে আসেনি, এবার আস্তে আস্তে শরীরের অন্যান্য বিশ্বাসী অস্তিত্বকে অতি নিপুনতায় সে বোঝাতে সক্ষম হয়: সাজিদ খান তাহলে এলেনই না। নীচের চত্বরে এসে সামান্য এগিয়ে থাকা মিঠামের হাত ধরে ফেলি, হালকা দৌড়ে। হোঁচট খাওয়ার পর শরীর যেমন টালমাটাল করে ওঠে, সাজিদ খানের প্রতি আমার আস্থা তেমনই নড়বড়ে হয়ে উঠছে, খুবই দ্রুত। সজনে ফুল খসার মতো নিঃশব্দে ঝরছে ওর প্রতি বিশ্বাস। লোকটি শেষ পর্যন্ত এলই না!

হোটেলের সামনে প্রসস্থ গলি প্রায় ফাঁকা। দু' একটি স্কুটার, কিছু নেশায় ডোবা অনিয়ন্ত্রিত পায়ের পথচারী, নগর পরিক্রমা শেষে ক্লান্ত সবজি ফেরিওয়ালা, এ সব দেখার শেষে তখনও চোখ পড়তে চাইছিল হঠাত্ ঢুকে পড়া সাজিদ খানের অটোরিকশায়। কিন্তু ভাবনা, শেষ পর্যন্ত ভাবনাই। তাকে বাস্তবায়িত করার কোনওরকম অলৌকিক ঘটনা অন্তত এই সময়ে ঘটল না।

আমরা বড় রাস্তা এবং গলিপথের মোড়ে। মিঠাম ও আমার মধ্যে একটুও কথাও হয়নি। হুস হাস শব্দে রাস্তার ও পাশ এ পাশ দিয়ে গাড়ি ছুটছে। তার মধ্যে অটোরিকশার সংখ্যা কম নয়। বেশির ভাগই আমাদের গন্তব্যের উল্টোদিকে দৌড়চ্ছে। সোজা হোক বা উল্টো, এই প্রায় মাঝ-রাতে কোনওটিই কিন্তু যাত্রীহীন নয়। ফলে আমরা যে যেতে চাই সে কথা জানাব কাকে! আবার আমার মনের কোণায় সেই সম্ভাবনা উঁকি দেয়। আমি প্রশ্রয় না দিলেও বেশ জঁাকিয়ে বসে। হঠাত্ যেন শুনতে পাচ্ছি, সাহাব, এসে গেছি। চমকালেও বুঝতে পারছি, আশার ছন্দটা সম্পূর্ণ কাটেনি। তালহীন হয়ে পড়লেও ধুঁয়ো দেওয়া চলেছে তখনও। কিন্তু কতক্ষণ? ঘড়িতে বারোটা পঞ্চাশ। হাতে আর মাত্র এক ঘন্টা পনেরো মিনিট! ঘড়ি দেখার পর শরীর জুড়ে এক শীতল অনুভূতি। হাত পা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। ভয় নাকি! পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়েও তো কিছু ভাবিনি। তাহলে চেতনের অন্তরালে কি সেই ভাবনাই চলছিল! উত্তেজনা এবার স্পষ্ট টের পাই। হাঁটুর জায়গাটা কেমন তির তির করছে।

কিছুই নজরে পড়েনি এতক্ষণ। দুটো অটোরিকশা লাগবে। একটাতে তো শুধু লাগেজ । পরিস্থিতি আন্দাজ করেই সাজিদ খানকে সারাদিন ধরে অত অনুরোধ করেছিলাম। দুটো লাগবে শুনে প্রথমে অবাক হয়েছিলেন। পরে প্রয়োজনীয়তা বুঝে আসার পথে স্টেশন থেকে আর একটা নিয়ে আসবেন বলেছিলেন। বিরক্তি নয় এখন রাগ হচ্ছে ওঁর ওপর। সব কথাই তাহলে কথার কথা হয়ে গেল সামান্য কয়েকটি টাকায়! সারাদিন ধরে একটা ভুলভাল লোকের সঙ্গে কাটালাম।

আরে এটা কী ভাবছি? আমি কি মেনে নিচ্ছি, সাজিদ সম্পর্কে বন্ধুদের এতক্ষণের সমস্ত মন্তব্য! নিজেকে সামলাই। কিন্তু পরমুহূর্তে আবার, লোকটা তাহলে আমাদের মুরগি করল! গাড়ি দৌড়ের শব্দ উথলে মিঠামের গলার আওয়াজ আমার কানে এল, 'ট্রেন সিওর মিস্!' মিঠামকে ভীষণ ঠাণ্ডা লাগছে এতক্ষণে। ও কি সব উত্তেজনা ঝরিয়ে আমার মধ্যে সে সব চালান করল! হঠাত্ই ডান পকেটে শব্দের ঝাঁকুনি। প্রথমটায় ঘাবড়ে গেলেও আস্তে করে বের করি মোবাইল। বিশাখ। এই রোমিং-এও ধরলাম। ও পাশ ঠাণ্ডা না গরম বুঝছি না কন্ঠস্বরে।কিরে পেলি কিছু?

না, ফাঁকা কিছুই দেখছি না।

তা হলে!

জানি না। রাখলাম।

মিঠাম জানতেও চাইল না, কে ফোন করেছিল। আচ্ছা গাড়ির যাতায়াত কমল কি! একটু লক্ষ করতে সেটা যে সত্যি বুঝতে পারি। কিছু সময় পর পর একটা কী দুটো। অপেক্ষাও কি অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে এরপর? কতক্ষণ কেটেছে? মাথা কাজ করছে না! কী যে পরিস্থিতি হল! হঠাত্ই দেবদূতের ভঙ্গিমায় মিঠামের গা ঘেঁষে এক অটোরিকশা এসে দাঁড়াল। মিঠাম এক চুল সময় না নিয়ে বলে ওঠে, স্টেশন?

উঠে পড়ুন।

আলোকিত রাস্তা, অথচ ভেতরের অন্ধকারে শুধুই কন্ঠস্বর। চালকের মুখ দেখা যায় না। দাঁড়ানোর ভঙ্গিমায় ছ্যাঁক করে সাজিদ খানকে মনে পড়েছিল। কিন্তু গলার আওয়াজ সে সম্ভাবনাকে নিশ্চিত করেনি। আমাদের আরও একটা চাই, লাগেজ আছে।

দাঁড়ান তা হলে একটু। এ বার চালক রাস্তায় নেমে আসেন। বিড়ি ধরান। আর আমরা আর একটির আশায় দাঁড়িয়ে। মিনিট চারেকের মধ্যে পেয়ে যাই। ঘড়ি একটা পনেরো ছুঁই ছুঁই।

দুটো অটোরিকশা ছুটছে। সামনেরটায় বিশাখ, উড়ান, মিঠাম। পেছনে আমি। দু' পাশে, পায়ের কাছে, পিছনে, কোলে লাগেজ। রাস্তা বিভাজিকার ও পাশ দিয়ে উল্টোমুখী গাড়ির আলো মাঝে মাঝে সেই হাসিটায় পড়েছে। সারাদিন দৌড়ে মুখে ভেসে থাকা হাসি একটুও ম্লান হয়নি। একই রকম ঝকঝকে। ছুটন্ত অটোরিকশার লুকিং গ্লাস অস্বাভাবিক কাঁপছে। তবুও চালকের আসনে বসে থাকা সাজিদ খানের মুখ দেখতে পেছন থেকে আমাকে ওই লুকিং গ্লাসের ওপরেই ভরসা করতে হচ্ছে। কখনও সে মুখ ঝনঝন করে কাঁপে আয়তাকার চৌহদ্দিতে। কখনও স্থির। পুকুরের জলে পাড়ের জিওল গাছটির ভেসে থাকার মতো।

হোটেলের নীচে আমরা তখন লাগেজ তোলায় ব্যস্ত, বড় রাস্তা থেকে নিয়ে আসা দুটো অটোরিকশার গায়ে গা লাগিয়ে থেমেছিল উল্টোমুখের তৃতীয়টি। আসন থেকে ছুট্টে এসেছিলেন চালক। সাজিদ খান। ব্যস্ততার মধ্যেও চমকে গেছি। মুখে কোনও কথা আনতে পারিনি। শুধু রাস্তার পরিশীলিত আলোয় তাঁর সমগ্র শরীরে খেয়াল করেছি রং না থাকা অস্থিরতা। আমাদের গোছগাছ প্রায় শেষ। আর দু' একটা ব্যাগ বাকি। ঠিক তখনই। যে অটোরিকশায় লাগেজ তুলছিলাম না, আকস্মিকতা কাটিয়ে সাজিদ খান সোজা তার চালকের কাছে গিয়ে কী সব যেন বলেছিলেন। আঞ্চলিক ভাষায়, আস্তে আস্তে। কিছুই বোধগম্য হয়নি। শুধু দেখেছিলাম, হঠাত্ অটোরিকশা ধা করে চলে গিয়েছিল। সাজিদ খান ওর হাতে কিছু যেন গুঁজে দিয়েছিলেন! তারপর দ্বিতীয় অটোরিকশা থেকে অতি দ্রুত লাগেজ নামিয়ে নিজেরটায় তুলতে শুরু করেন। আমরা চারজন পরস্পর পরস্পরকে গভীরভাবে দেখেছি। চাহনি বিনিময় করেছি। উড়ান কিছু একটা বলতে গেলে চাহনিতেই থমকে দেওয়া হয়েছিল। মাঝরাতের নিস্তব্ধ শহরে আরও কিছু শব্দহীন বাক্য ঢেলেছি। কাজেই ঘন নৈঃশব্দ্যের মধ্যেই কাজ হয়ে চলে। অনুমতিহীন, আলোচনাহীন। আর যার পুরোধা কিন্তু একমাত্র সাজিদ খান।

আসুন। একজন আমারটায়। আর বাকিরা ওটায় উঠুন। তাড়াতাড়ি, সময় কিন্তু নেই।

রাতের ঝঞ্ঝাটমুক্ত রাস্তা পেরিয়ে একুশ চুয়াল্লিশ অওরঙ্গাবাদ রেল স্টেশনে যখন আমাকে নামাল, তখন

একটা চল্লিশ। স্টেশনে আসার পথে একটা শব্দ উচ্চারণ করিনি। দু' শো টাকা বা বারোটাতে না আসা, কোনওটাই নয়। সাজিদ খান-ও বিবরণের পথে হাঁটেননি। শুধু ছুটেছেন স্টেশনের দিকে। স্টেশন চত্বরে থেমেই, বিশাখদের অটোরিকশার দিকে দৌড়ালেন। ওই চালকের হাতেও কিছু যেন দিলেন। এবার আমার কাছে এসে, 'নেমে পড়ুন' বলে, সমস্ত মালপত্র নামাতে থাকেন। তারই ফাঁকে উড়ানের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'টিকিটগুলো কেটে ফেলুন, একটা প্ল্যাটফর্ম টিকিটও কাটবেন।' আমরা চারজনেই হাঁ করে দেখছি ওঁর কীর্তিকলাপ। এবার বেশ কিছু লাগেজ নিজের মাথায়, হাতে যতখানি সম্ভব নিয়ে স্টেশনের ভেতরে ঢুকে গেলেন। বাকিটা আমরা তুলে নিই।

মধ্যরাতের অওরঙ্গাবাদ স্টেশন। ফাঁকা ফাঁকা। চার নম্বর প্লাটফর্ম। বোর্ডে ট্রেনের নাম, নম্বর ও সময়। ঘড়িতে একটা পঞ্চাশ। মাছের ঝাঁকের মতো কোথাও কোথাও অপেক্ষমান মানুষ। মানমাড় প্যাসেঞ্জারের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। আমি সাজিদ খানের সামনে। তিন বন্ধু এ-দিক ও-দিক। আমাদের দেখছে। ওদের এই দূরে থাকা লজ্জায় না রাগে জানি না। কারণ বিশ্লেষণের ইচ্ছে নেই। কাছে ডাকতেও মন চাইছে না। তবে কারণ যে আছে বুঝতে পারছি। তা না হলে, গত কয়েক ঘন্টা ধরে বয়ে বেড়ানো উত্তেজনা এতক্ষণে উগরে দিত সাজিদ খানের ওপর।

পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমে ঘোষণা হচ্ছে। ট্রেন যাতায়াতের। সাজিদ খান আমার হাতের দিকে ওঁর বুক পকেট থেকে বের করে আনা কিছু এগিয়ে দিয়ে বললেন, সাহাব, আপনারা ভুল করে আমাকে দু' শো টাকা বেশি দিয়েছিলেন, এই নিন, এখনকার সবটা বাদ দিয়ে এই বিরাশি টাকা।

সোডা ওয়াটার বোতল ঝাঁকুনি খেয়ে যে ভাবে তরল বেরোয়, গলগল করে, তেমনই এতক্ষণ ধরে আমার ভেতরে জমে থাকা অপরাধবোধ বেরিয়ে আসতে চাইছে। প্রথমে আমার দিকে বাড়িয়ে ধরা হাত তারপর সমগ্র মানুষটিকে জড়িয়ে ধরলাম। একটা শরীর আমার দু' হাতের আড়ালে। একটা মানুষ আমার আলিঙ্গনে। আর একটা অসহয়তা আমার শরীর জুড়ে। এই ছোঁয়াছুঁয়িতে ভেসেছে আমার চোখ। সাজিদ খানের মুখে সারাদিনের সেই হাসি জলে ভেজা।

আপনাদের নামিয়ে দিয়ে ঘরে গিয়েছিলাম। কাল থেকে বাবলু খানের খুব জ্বর । তাই সকালে আসতেও দেরি হয়েছিল। এখনও সময়ে আসতে পারলাম না। আমায় ক্ষমা করে দেবেন সাহাব।

চার নম্বরে তিরতির করে ঢুকছে মানমাড় প্যাসেঞ্জার। সিগন্যালের রং সবুজ।

প্রবন্ধ

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির 'মিথ' ও 'রূঢ় বাস্তবতা'

গোপাল বাগচী

সংখ্যালঘু কে?
মানুষই সংখ্যালঘু, যখন সে
বঞ্চিত হয় আন্ মানুষের কাছে,
সংখ্যালঘু জন্ম নেয় সংখ্যাগুরুর উদয়ে।
তুমি-আমি সকলেই সংখ্যালঘু
পৃথিবীর কোনো-না-কোনো ঘাটে,
জীবনের কোনো-না-কোনো সময়ে।

সংখ্যায় লঘু, নয় সে লঘু-
যখন রাষ্ট্র থাকে তাঁর পাশে।
সংখ্যাতত্ত্ব ঘুচিয়ে মানুষ বাঁচুক শুধু মানুষে।
(গোপাল বাগচী)

সাম্প্রদায়িকতার পূর্বাপর কথা

১৯৪৭ সালে জিন্নাহ্‌র ধর্মভিত্তিক জাতীয়বাদ অর্থাৎ দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতেই দেশভাগ ভাগ হয়েছিল- যার মূল কথা ছিল হিন্দু ও মুসলমান দুটি আলাদা জাতি (যদিও এর কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই), যেন তারা আর এক সঙ্গে থাকতে পারে না। যার পরিণতিতে হিন্দু, মুসলিম আর শিখ ধর্মের মানুষেরা ইতিহাসের ভয়ংকরতম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মেতে উঠেছিল। বলা হয়ে থাকে, ব্রিটিশরা ভারতে 'ডিভাইড এন্ড রুল' নীতির মাধমে সাম্প্রদায়িকতাকে ব্যবহার করেছিল। তবে এর মূল উৎস আরও আগের, ধর্মের আদিতে। যেদিন থেকে ধর্মের প্রচলন হয়েছে এবং যে উদ্দেশ্যে, ঠিক সেদিন থেকেই অধর্মেরও প্রচলনও শুরু হয়েছে। অর্থাৎ ধর্মের মধ্যেই অধর্মের বীজ নিহিত ছিল। সময়ের সাথে সাথে স্বার্থের নিরীখে তা মহীরুহে পরিণত হয়েছে, অন্তত আজকে আমাদের এই উপমহাদেশে। দ্বিজাতিতত্ত্বের সিঁড়ি বেয়ে উগ্র সাম্প্রদায়িকতা আজ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেতে বসেছে।

'বাঙালি মুসলমানের মন' প্রবন্ধে আহমদ ছফা লিখেছেন, হিন্দু বর্ণাশ্রম প্রথাই এ দেশের সাম্প্রদায়িকতার আদিতম উৎস। কথাটির যৌক্তিকতা আছে। শঙ্করাচার্যের আবির্ভাবের ফলে প্রাচীন আর্যধর্মের নব জীবন লাভে বৌদ্ধদের এদেশে টিকে থাকা যখন প্রায় কঠিন হয়ে দাঁড়াল, তখন ত্রয়োদশ শতকে এদেশে তুর্কী আক্রমনে ও মুসলমান রাজশক্তির প্রতিষ্ঠায় ভীত-সন্ত্রস্ত বৌদ্ধরা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এর সপক্ষে এক বৌদ্ধ কবির একটি ব্যাঙ্গাত্মক লেখার (শূণ্যপুরাণের অন্তর্গত 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' কবিতা) অংশবিশেষ এরকম:

ব্রহ্মা হইল মহামদ বিষ্ণু হইলা পেগাম্বর
আদম হইল শূলপাণি।
গনেশ হইল কাজী কার্ত্তিক হইল গাজী
ফকির হইল যত মুনি ॥
তেজিয়া আপন ভেক নারদ হইল শেখ
পুরন্দর হইল মৌলানা।
চন্দ্র সূর্য আদি দেবে পদাতিহ হয়্যা সেবে
সভে দেখি বাজায় বাজনা ॥

বোঝা যায়, বৌদ্ধ কবির ক্ষোভ থেকেই এমনটি লেখা। তবে শুধু বৌদ্ধতেই সীমাবদ্ধ নয়। সামাজিক নির্যাতন ও বঞ্চণার কারণে হিন্দু সমাজের তথাকথিক নিম্নবর্ণ থেকেও ইসলাম ধর্মে আশ্রয় গ্রহণ করে। ফলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি যে ক্ষোভ ও বিতৃষ্ণা নিয়ে এরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়, ধর্মান্তরিত হয়েও সেই ক্ষোভ তাদের প্রশমিত হয়নি, বরং তা বংশ পরম্পরায় প্রবাহিত হতে থাকে। তদুপরি ইচ্ছের বিরুদ্ধে এ ধরণের ধর্মান্তরিত হওয়ার মনোকষ্ট থেকে প্রতিশোধ নেয়ার একটি স্পৃহা জেগেই থাকে। কাজেই বর্ণপ্রথা এ উপমহাদেশে একটি বিরাট নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে যার কারণে ইতিহাসই বদলে গেছে।

অতীতে মানুষ সাম্প্রদায়িক ছিল না। সাম্প্রদায়িক ছিল শাসকবর্গ। মোঘল, ব্রিটিশ, পাকিস্তান ও স্বাধীন বাংলাদেশেও শাসক পর্যায়ে সাম্প্রদায়িকতাকে কাজে লাগানো হয়েছে খেলামেলাভাবেই। রাজনীতিবিদ ও ধর্মব্যবসায়ীরা সাম্প্রদায়িকতার চাষ করেছেন নিজেদের স্বার্থে। মোঘল আমলে অমুসলিমদের জন্য জিজিয়া কর ধার্য করেছিরেন সম্রাট আওরঙ্গজেব । বহু হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেছিলেন। দুজন শিখ গুরুকে (৫ম ও ৯ম) হত্যা করেছিলেন সম্রাট জাহাঙ্গীর ও সম্রাট আওরঙ্গজেব যথাক্রমে ১৬০৬ ও ১৬৭৫ সালে। কিন্তু ব্রিটিশরা বেনিয়ার জাত। তারা ধর্মে হাত দেননি। শুধু শাসন করে গেছে ধন সম্পদের জন্য। সেই সম্পদে ব্রিটেনে শিল্প বিপ্লব ঘটিয়েছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ঘাটিয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষে আপন ধর্মের প্রচার-প্রসারে যায়নি। তবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করে শাসনকার্য চালিয়ে গেছে, যার পরিণতি ১৯৪৭ এ দেশভাগ, বাংলাভাগ, পাঞ্জাবভাগ ও কাশ্মীরের বিভক্তি।

৫২-এর ভাষা আন্দোলনকে পাকিস্তানীরা ভারত তথা হিন্দুদের সৃষ্ট বলে বিশ্বাস করত। এ নিয়ে তারা একঢিলে একাধিক পাখি মারতে চেয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানে ভাষা আন্দোলকে কেন্দ্র করে যে বাঙালী জাতীয়তাবাদ ক্রমশ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল তা শাসকদের কাছে বিপজ্জনক মনে হয়েছিল। আবার পূর্ব পাকিস্তানের বাংলাভাষী নাগরিকদের সংখ্যা হ্রাস করে পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও গুরুত্ব বাড়ানোই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য। কাজেই কোনো না কোনোভাবে দাঙ্গা সৃষ্টি করে হিন্দুদের বিতাড়ন করাই ছিল পশ্চিম পাকিস্তনের লক্ষ্য। এর জন্য নানা নিবর্তনমূলক কাজ, শত্রু সম্পত্তি আইন, হিন্দু অধুষ্যিত এলাকায় ক্ষতিপূরণ ছাড়াই শিল্প-কলকারখানা স্থাপন, পাহাড়িদের সরিয়ে কাপ্তাই বাঁধের জন্য জমি অধিগ্রহন, একের পর এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও সর্বশেষ ৭১-এ মুক্তিযদ্ধে হিন্দু নিধনযজ্ঞে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল পাকবাহিনী।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এ দেশে আর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি। কারণ দাঙ্গা হতে দুপক্ষেরই শক্তি লাগে। যা হয়েছে তা এক পক্ষের হামলা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ ও হত্যা।

কেন এদেশের বিরাট একটি অংশ ধীরে ধীরে সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠল?

৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই পাকিস্তানী দোসরদের বিরোধীতার সম্মুখীন হয়েছিল দেশটি। দীঘদিন পরে হলেও যুদ্ধাপরাধী হিসেবে তারা কোর্টে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও প্রতিক্রিয়াশীলদের তৎপরতা থেমে থাকেনি। ৭৫ এর পট পরিবর্তনের পর সামরিক শাসক ক্ষমতায় আসে। উচ্চাভিলাষী জিয়াউর রহমান তখন মসনদে। তাঁর দরকার ছিল ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করা। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের কথা বললে, স্বাধীনতার কথা বললে সমস্ত ক্রেডিট চলে যায়

আওয়ামীলীগের একাউন্টে। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবেও তিনি তাতে স্বস্তিবোধ করেননি কখনো। বিকল্প হিসেবে ভিন্ন পথ বেছে নেন। স্বাধীনতাবিরোধীদের সাথে তিনি গাঁটছড়া বাঁধেন। রাজনীতিতে তাদেরকে পুনর্বাসন করেন। ১৯৭৬ এ গোলাম আযমকে পাকিস্তান থেকে ফিরিয়ে এনে নিষিদ্ধ জামাতের রাজনীতি করার সুযোগ করে দেন। ধর্মীয় বাতাবরণে দেশে একটি ভারতবিরোধী সেন্টিমেন্ট তৈরি করে সমর্থক তৈরি করেন, রাজনীতিকে জটিল করে তোলেন। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত ও প্রতিষ্ঠিত প্রতিটি বিষয়কে তিনি বিতর্কিত করে তোলেন। অহংকারের সংবিধান কাঁটাছেঁড়া করে ধর্ম নিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র বাতিল করে দেন। পরিণতিতে জনমানসে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে আড়াল করে ধীরে ধীরে ধর্মীয় চেতনাকে জাগিয়ে তোলেন যা পুরোপুরি পাকিস্তানী ভাবধারার। এভাবে তিনি আশাতীতভাবে সফল হন। তারপর দল গঠন। পরবর্তীতে আরেক সামরিক শাসক হোসেইন মো. এরশাদ একই পথ অনুসরণ করেন। তিনি আরও একধাপ এগিয়ে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ‘ইসলাম’ সংবিধানে সংযোজন করেন। ক্ষমতার জন্য তিনিও ধর্মকে প্রকটভাবে ব্যবহার করেছেন। এরপর বেগম খালেদা জিয়া শুধু ধারাবাহিকতা রক্ষা করে গেছেন। ততদিনে ভুল রাজনীতি ফুলে-ফলে বিকশিত হয়েছে। দেশটিও ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। বলতে গেলে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

উপরোক্ত সবই ছিল সামরিক তথা পাকিস্তানি ভাবধারার কর্মকান্ড। বিপরীতে আওয়ামী লীগ কী করল? আওয়ামী লীগ ৭৫ এর পর ২৩ বছর ক্ষমতার বাইরে ছিল। এই দীর্ঘ ২৩ বছরে বুড়িগঙ্গা দিয়ে অনেক দূষিত পানি গড়িয়েছে। আওয়ামী লীগের দুর্ভাগ্য যে, স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দলটি রাজনীতিতে ভালো কোনো অপজিশন পায়নি। বাম রাজনীতিও একটা সময় ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে থাকে ও পরে ঝিমিয়ে পড়ে। কিন্তু ময়দান খালি থাকে না। আবর্জনা দিয়ে হলেও তা পূর্ণ হয়ে যায়। আওয়ামী লীগকে রাজনীতি করতে হয়েছে সামরিক শাসক, যুদ্ধাপরাধী, ষড়যন্ত্রকারী, মৌলবাদী গোষ্ঠীর বিপরীতে। অর্থাৎ অসুস্থধারার রাজনীতিকে মোকাবেলা করতে হয়েছে জীবনভর। ফলে আওয়ামী লীগকে তার সুন্দর পরিকল্পনা থেকে কখনো কখনো সরে আসতে হয়েছে, আপোস করতে হয়েছে বা বাধ্য হয়েছে প্রতিশোধ-প্রতিহিংসার রাজনীতি মোকাবেলা করতে। স্বাধীনভাবে দেশের কল্যানে কাজ করতে খাবি খেয়েছে দলটি। এভাবে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের সুযোগে দেশে অপরাজনীতির ধারক বাহক মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেছে। এবং দেশে একটি অসাম্প্রদায়িক চেতনার পরিবর্তে সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান ঘটেছে। রাজনীতির এই ঘোলাজলে পড়ে আওয়ামী লীগও কোনো কোনো সময় সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। এবং তার মাশুলও দিয়েছে দলটি তথা জাতি।

রাজনীতির এই বন্ধ্যাত্বর সুযোগে আরেকটি সামাজিক উপসর্গ যোগ হয়েছে, যা সমাজেকে কলুষিত করে চলেছে। ড. জাকির নায়েকের পীচ টিভির কল্যাণে একটি মারাত্মক রেডিক্যাল গ্রুপ তৈরী হয়েছে দেশে। মানুষটির চাতুর্যপূর্ণ লেকচারের আড়ালে ছিল ইসলামের প্রসার ঘটানো। এরপর দেলোয়ার হোসেন সাঈদী থেকে হাল আমলের সমস্ত ওয়াজীরা নিম্নরুচীর ওয়াজ করে যাচ্ছে। সেখানে ধর্মীয় আলোচনার চেয়ে প্রাধান্য পায় সংখ্যালঘু, ভিন্ন ধর্ম ও নারী নিয়ে ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়ানো। সোশাল মিডিয়ায় সাধারণ মানুষ পর্যন্ত সেসব দিনরাত দেখছে। এভাবে একটি দেশের মনন ঘটনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাইতেও এই ওয়াজ বিশাল ভূমিকা রেখে চলেছে, যা সাম্প্রদায়িক জাতি গঠনে বিশাল ভূমিকা রাখছে। ২০১৬ সালে গুলশানে হোলি আর্টিজান হত্যাকান্ডের ঘাতকেরা ড. জাকির নায়েকের থেকে প্ররোচনা পেয়েছে বলে পত্র পত্রিকায় খবর এসেছিল তখন। মর্মান্তিক সে ঘটনা।

এছাড়াও ভারতের ঘটনাসমূহ প্রতিবেশি দেশের ওপর প্রভাব ফেলে। ভারতে বিজেপি’র উত্থান ও ১৯৯২ সালে বাবরী মসজিদ ভাঙার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে এখানকার মানুষের মনে। মানুষ সাম্প্রদায়িক হয়ে ওঠার এটি একটি বড় কারণ হয়ে ওঠেছে দীর্ঘদিনে।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি পরোক্ষ কারণ তুলে ধরা যায়, যার অভাবে জাতির মানস গঠনে বিরূপ প্রভাব পড়েছে।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের ফলে তৎকালীন পূর্ববঙ্গ থেকে বেশিরভাগ হিন্দুই চলে যায়, বিশেষ করে শিক্ষাদীক্ষায় যারা অগ্রসর শ্রেণি। ফলে শিক্ষা, সাংস্কৃতি ও চিকিৎসাসহ নানা ক্ষেত্রে পেশাদারিত্বে হঠাৎ করে একটি শূণ্যতার সৃষ্টি হয়, যা আর পূরণ হয়নি। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ডে বাংলাদেশ ফের মেধাবীদের হারায়। ফলে বাংলাদেশে পেশাদারিত্বে এবং বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় ঘাটতি রয়েই যায়। আজ বাংলাদেশে ৫৩ বছর পর আমরা দেখি- বিজ্ঞানী, দার্শনিক, গবেষকের পরিবর্তে উত্থান ঘটেছে মোল্লা শ্রেণির ও দুর্বৃত্ত শ্রেণির। অর্থাৎ ৪৭ ও ৭১ এর ঐ শূণ্যতা পূরণ হয়েছে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী দিয়ে, অপশক্তি দিয়ে। আগেই বলেছি, মাঠ খালি থাকে না।

বস্তুতঃ সারা বছর ধরেই সংখ্যালঘু নির্যাতন কম-বেশি চলে। তবু সরকারবিরোধী আন্দোলন ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে সাথে হামলার টার্গেট হয় এদেশের সংখ্যালঘুরা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হামলা হয় সরকার পতনের পর ‘বিজয় মিছিল’ থেকে ও নতুন সরকার দায়িত্ব নেয়ার আগ পর্যন্ত। এটি একধরণের দায়িত্ব এড়ানোর কৌশল এবং উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার বাসনা থেকে হয়ে আসছে।

সংখ্যালঘু তথা দেশের জন্য চরম ব্যর্থতা ও হতাশার হলো, দেশ স্বাধীন হবার ৫৩ বছর পরও ক্ষমতা হস্তান্তরের সুষ্ঠু প্রক্রিয়াটি বাংলাদেশ অর্জন করতে পারল না। এর পক্ষে যতই কারণ থাক, কিন্তু তার বিষময় ফল ভোগ করতে হয় সংখ্যালঘুদের এবং তা সর্বাগ্রে ও সর্বোচ্চ পর্যায়ে । পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতেও রাজনৈতিক দল আছে, তাদের মতপার্থক্য আছে, সেখানেও নির্বাচন হয়, ক্ষমতা হস্তান্তর হয়, কিন্তু তাদের নিস্পত্তি করা মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে বাংলাদেশের মতো বিরোধ নেই। এবং ক্ষমতা পরিবর্তনের সাথে সেসব উল্টেও যায় না। পাকিস্তানেও ক্ষমতা হস্তান্তরে জটিলতা হয়, তবে সেখানে সেনাবাহিনী একটি বড় ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে।

সংখ্যাগুরুর সাম্প্রদায়িক কর্মকান্ডের মাঝে পড়ে একজন সংখ্যালঘুর অসাম্প্রদায়িক চেতনা ধরে রাখা কতটা কঠিন তা একমাত্র ঐ সংখ্যালঘুই জানে।

সমাজের কোন শ্রেণি সাম্প্রদায়িকতা প্রমোট করে?

বাঙালি জাতিগতভাবেই উদার এবং অসাম্প্রদায়িক। গ্রামে-গঞ্জে আজো তার নিদর্শন মেলে। সেখানে কৃষিজীবি-শ্রমজীবী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের সব সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক। মেলামেশা, চলাফেরায় তেমন কোনো বিভেদ চোখে পড়ে না। জমি-জমা, বিল-বাওড়ের স্বত্ব-দখল নিয়ে দাঙ্গা-কাজিয়া যে হয় না, তা নয়। তবে তা সাম্প্রদায়িক রঙে রঞ্জিত হয় না। কিন্তু রাষ্ট্র, রাজনীতি, এবং শহুরে সচেতন শ্রেণির বদৌলতে দিন তা বদলে যেতে শুরু করেছে আরও আগে থেকেই । সাম্প্রদায়িকতার ধারক-বাহকরূপে অবতীর্ণ হয়েছে তারা। মধ্যবিত্ত এবং শিক্ষিত-সচেতন শ্রেণির দ্বন্দ্বের নির্যাস সাম্প্রদায়িকতারূপে ছড়িয়ে পড়ে সমাজের অপরাপর অংশে। এ শ্রেণি চাকুরীর অধিকার, ভূমির অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার, ক্ষমতার অধিকার নিয়ে অনিশ্চয়তায় ভোগে। কারণ তাদের বিদ্যা এবং অবস্থান সরাসরি উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত নয়। রাজনীতি, চাকরী আসল মানুষটিকে প্রকাশ হতে দেয় না, আড়াল করে রাখে এবং শেষমেশ দায়িত্বপালনের যন্ত্রে পরিণত করে। প্রেমহীনতা মানুষকে মানুষ থাকতে দেয় না। এভাবে সামরিক-বেসামরিক শাসকদের অভিপ্রায় ও স্বার্থে সাধারণ মানুষকেও সাম্প্রদায়িকমুখী করানো হয়েছে। অপরিচিত বৃহৎ মানবগোষ্ঠীর সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী, ব্যবহার কীরূপ, কতটা মানবিক- এ নিয়ে ভাববার আছে।

সাম্প্রদায়িক হামলার ধারাবাহিকতা

ফেসবুকে ধর্ম অবমাননা করা হয়েছে, এমন উস্কানিমূলক পোস্টিং দিয়ে সাম্প্রদায়িক হামলা শুরু হয় সেই ২০১২ সালে কক্সবাজারের রামু থেকে। এরপর ২০১৬ সালে ব্রাক্ষণবাড়িয়ার নাসিরনগর,

২০১৭ সালে রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলার হরকলি ঠাকুরপাড়া গ্রাম, ২০২১ সালে সুনামগঞ্জের শাল্লা, একই বছর খুলনার রূপসা উপজেলার শিয়ালী গ্রামে হামলা হয়েছে। হরকলি ঠাকুরপাড়া গ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের ৮টি বাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়। তাতে ১৫টি ঘর ও ১টি মন্দির ভস্মীভূত হয়। এলাকায় বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়িয়ে জামায়াত-শিবিরের নেতৃত্বে কয়েক হাজার মানুষ জমায়েত ও মিছিল করে। তারপর সংঘবদ্ধ হয়ে হামলা চালায়।' সেসময় টিটো রায়ের বৃদ্ধা মায়ের কান্নার ছবি পত্রিকাতে এসেছিল।

সংখ্যালঘুদের ওপর বড় হামলা হয় রামু, নাসিরনগর ও কুমিল্লাতে দুর্গাপূজায়। ২০২১ সালে দুর্গাপূজায় কুরআন অবমাননার অভিযোগে কুমিল্লার নানুয়া দীঘির পাড়ে পূজামন্ডপে হামলা চালানো হয়। সে বছর ১৩ অক্টোবর অষ্টমী পূজার দিনে পূজামন্ডপে হনুমানের মূর্তির হাঁটুর উপর কুরআন রাখার খবর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এই খবরকে কেন্দ্র করে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ এনে পূজামন্ডপে হামলা চালায় ও হিন্দুধর্মালম্বীদের মারধর করে। ১ নভেম্বর পর্যন্ত ওই সময় দেশের ২৭টি জেলায় ১১৭টি মন্দির-পূজামন্ডপ ভাঙচুর করা হয়। ৩০১টি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও বসতবাড়ি হামলা ও লুটপাটের শিকার হয়। নিহত হয় ৯ জন। পরবর্তীতে সিসিটিভি ফুটেজে ইকবাল নামে এক যুবককে পূজামন্ডপে কোরআন রেখে হনুমানের গদা কাঁধে নিয়ে হেঁটে যেতে দেখা যায়। এভাবেই পরিকল্পিতভাবে ধর্ম অবমাননার মিথ্যা অভিযোগ তৈরি করে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা চালানো হয়। হামলার এমন অপকৌশল নিয়ে সরকার কখনো মাথা ঘামায়নি।

ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার অভিযোগ এনে হামলা চালান যেন একটি প্রথায় পরিণত হয়েছে। মাইকে ঘোষণা দিয়ে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীটি হামলা চালায়। অনেক সময় প্রশাসনের সহযোগিতা চেয়েও কোনো প্রতিকার পাওয়া যায় না। উদ্বেগজনক হলো, একটি ঘটনারও প্রকৃত অপরাধী শনাক্ত না হওয়া ও বিচার না হওয়া। মাঝখান থেকে বিনা অপরাধে জেল খেটেছে ভুক্তভোগী নিরীহ মানুষগুলো, যাদের নামে পোস্টিং দেয়া হয়েছে তারা অনেকে লেখাপড়াও জানেন না। রামুর উত্তম বড়ুয়া, নাসিরনগরের জেলে সম্প্রদায়ের রসরাজ দাস, রংপুরের লেখা-পড়া না জানা টিটো রায়, সিলেটের রাকেশ রায়, সুনামগঞ্জের শাল্লা উপজেলার ঝুমন দাশ, হাল আমলের উৎসব মন্ডলসহ আরও অনেক ভুক্তভোগী আছে। উৎসব মন্ডলকে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নির্যাতন করে। তার ও তার পরিবারের বর্তমান অবস্থা অজ্ঞাত।

২০১৬ সালে গাইবান্ধার গবিন্দগঞ্জে উচ্ছেদ অভিযানের নামে সাঁওতালপল্লীতে হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ও গুলি করে হত্যার ঘটনা ঘটেছে সরকারী ছত্রছায়ায়। সেখানে পুলিশও আগুন লাগোনোর কাজে জড়িত ছিল। মধুপুরে আদিবসীদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ, দিনাজপুরে কান্তজির মন্দির উচ্ছেদের চেষ্টা, শ্রী শ্রী অনুকূল ঠাকুরের আশ্রমের দু'জন সেবায়েত হত্যা- এরকম বহু নজির জ্বলজ্বল করছে। ক্ষমতার ছত্রছায়ায় এসব ঘটতে থাকে একে একে। বিচার হয় না বলে তারা আর প্রতিকার চায় না। মানবাধিকার কর্মীরাও অনেক সময় চুপ থাকেন। এটা একটা বিপজ্জনক অবস্থা এবং সাংবিধানিক অঙ্গীকারের বরখেলাপ। প্রশ্ন হলো, জনপ্রতিনিধি, সরকারী কর্মচারি, পুলিশ কেন সংখ্যালঘু নির্যাতনে অংশ নেবে?'

কার কাছে প্রশ্ন করবেন? ঢাকেশ্বরী মন্দিরের কথাই দেখুন। এটি একটি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং জাতীয় মন্দির। হিন্দুদের বিশাল একটি আবেগ-অনভূতির স্থান। তবু সেখানকার ২০ বিঘা জমির মধ্যে ১৪ বিঘাই বেদখল হয়ে গেছে। মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে জমি পুনরুদ্ধারের জন্য। ঢাকেশ্বরী মন্দিরের বেলাতেই যদি এমন অবস্থা হয় তা হলে বুঝতেই পারছেন সংখ্যালঘুদের সম্পদ কোন তোপের মুখে আছে!

'বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ' - বহুল উচ্চারিত এ বক্তব্যটি তার যথার্থতা হারিয়েছে বহু আগে থেকেই। এর উজ্জ্বল দিকটি এখন আর নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস

তাঁর এক লেখায় এটিকে 'মিথ' বলে যুক্তিপূর্ণ বর্ণনা করেছেন। এটি রাজনৈতিক মঞ্চেই বেশি উচ্চারিত হয়, দায় এড়ানোর জন্য। বাস্তবতা হলো প্রতিবছরই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে।

সংখ্যালঘু নির্যাতনের সাম্প্রতিক চিত্র

গত ১২ সেপ্টেম্বর প্রথম আলোয় 'হামলার শিকার সংখ্যালঘু স্থাপনা' শীর্ষক এক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিবেদনে সরকার পরিবর্তনের দিন থেকে অর্থাৎ ৫ আগস্ট থেকে ২০ আগস্ট পর্যন্ত ১৬ দিনের হামলার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে মাত্র। তাতে দেখা গেছে মোট ১০৬৮ টি স্থাপনা হামলার শিকার হয়েছে। তবে তা সার্বিক চিত্র নয় বলে পত্রিকাটি মত প্রকাশ করেছে। প্রথম আলোর অনুসন্ধানে দেশের ৬৪ জেলার মধ্যে ৪৯টিতেই হামলার তথ্য পাওয়া গেছে। সংখ্যালঘুদের বাড়িঘর, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও উপাসনালয়ে হামলা-ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। সবচেয়ে বেশি হামলার ঘটনা ঘটেছে খুলনা বিভাগে। সেখানে হামলা হয়েছে ২৯৫টি প্রতিষ্ঠানে। তারপর রংপুর বিভাগে ২১৯টি, ময়মনসিংহ বিভাগে ১৮৩টি, রাজশাহী বিভাগে ১৫৫টি। ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশাল ও সিলেট বিভাগে হামলা অন্য বিভাগগুলোর তুলনায় কম। সবচেয়ে কম সিলেট বিভাগে, ২৫টি। যেসব জায়গায় হামলা হয়নি, সেখানেও মানুষ ব্যাপক আতঙ্কে ছিল। আতঙ্ক এখনো পুরোপুরি কাটেনি।

এর পাশাপাশি বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদও গত ১৯ সেপ্টেম্বর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক সংবাদ সম্মেলনে ১৭ দিনের (৪ থেকে ২০ আগস্ট পর্যন্ত) সাম্প্রদায়িক সংহিসতার তথ্য তুলে ধরেন। এতে ২০১০টি সংহিসতার ঘটনা ঘটেছে। এরমধ্যে ৯ জন নিহত ও ৪ জন ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। এ ছাড়াও ৬৯টি উপাসনালয়, ৯১৫টি বাড়িঘর, ৯৫৩টি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ, ৩৮টি শারীরিক নির্যাতন এবং ২২টি দখলের ঘটনা ঘটেছে। এর বাইরে আরও সাম্প্রদায়িক সংহিসতার ঘটনা রয়েছে, যার তথ্য তাঁদের হাতে আসেনি। রিপোর্টে রাজনৈতিক সংহিসতার ঘটনা অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। এখানেও রিপোর্টে সবচেয়ে বেশি সংহিসতার ঘটনা ঘটেছে খুলনা বিভাগে, ৮১০টি। তারপর রাজশাহী বিভাগে, ২৯৭টি, রংপুর বিভাগে ২৭১টি, ময়মনসিংহ বিভাগে ২২৪টি। এখানেও সবচেয়ে কম সিলেট বিভাগে, ৬২টি।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ প্রতিবছরই সাম্প্রদায়িক সংহিসতার তথ্য তুলে ধরেন। কিন্তু সরকার নির্বিকার থাকেন।

৫ আগস্টের পর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৪৯ জন সংখ্যালঘু শিক্ষককে জোর করে পদত্যাগ করানো হয়েছে। এ সংখ্যাটি আরও বেশি। এর মধ্যে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিও আছেন। এদিকে সরকারী দপ্তরে হিন্দু কর্মচারীর সংখ্যা জানতে চেয়ে একটি সরকারী দপ্তর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এমন বিজ্ঞপ্তির দৃষ্টান্ত এর আগে বাংলাদেশে নেই। এমনকি এ উপমহাদেশেও এ ধরনের সরকারী চিঠির কোনো নজির নেই। তত্ত্বাবধায়ক সরকার এ বিষয়ে নির্বিকার ভূমিকা পালন করে গেছেন। মব জাস্টিস প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে চলেছে।

হিন্দুধর্মালম্বী ছাড়াও হামলা হয়েছে খ্রিস্টান, আহমদিয়া এবং পাহাড়ে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ওপর। ঢাকায় রোমান ক্যাথলিক চার্চের আর্চবিশপ বিজয় ডি ক্রুজ বলেন, আমরা এদেশে ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে শান্তিতে বসবাস করতে চাই। কিন্তু নানা সময় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা হয়। কিন্তু হামলাকারীদের শাস্তি হয় না। অথচ শাস্তি নিশ্চিত করা না গেলে হামলা বন্ধ হবে না।

দিনাজপুর, রাজশাহী, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও ঠাকুরগাঁওয়ে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ওপর অন্তত ১৮টি ঘরবাড়ি ভাঙচুর অথবা আগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। জমি দখল ও মাছ লুটের দুটি ঘটনা ঘটেছে। দিনাজপুরে সাঁওতাল বিদ্রোহের ঐতিহাসিক দুই চরিত্র সিধু মুর্মু ও কানু মুর্মুর ভাস্কর্য ভাঙচুর করা হয়েছে।

আহমদিয়া সম্প্রদায় জানিয়েছে, পঞ্চগড়, রংপুর, রাজশাহী, নীলফামারী, শেরপুর, ময়মনসিংহ ও ঢাকার

মাদারটেকে হামলায় তাঁদের ১৩৭টি বাড়িঘর ও ৬টি আহমদিয়া মসজিদ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তাঁদের জনসংযোগ সম্পাদক আহমাদ তাবশির চৌধুরী বলেন, আমরা রাজনীতি করি না, কোনো দলের সাথে সম্পর্ক নেই। আমার মনে হয়, এবারের আক্রমন হয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সক্রিয় না থাকার সুযোগে।

খুলনার কয়রা উপজেলার সুজিত রায় বলেন, ৫ আগষ্ট সন্ধ্যার দিকে বাড়িতে হামলা করতে আসছে শুনে তাঁরা বাড়ির সবাইকে নিয়ে আরেক বাড়িতে চলে যান। যেতে যেতেই শুনতে পান ভাঙচুরের শব্দ। ঘরের চাল থেকে শুরু করে আসবাবপত্র-- সব ভেঙেচুরে দিয়ে গেছে। হামলার কথা শুনে অনেকেই আগেভাগে এভাবে বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়েছে।

রাজশাহীতে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মানুষের ওপরও হামলা হয়। ৫ আগষ্ট মোহনপুর উপজেলার পাহাড়িয়া সম্প্রদায়ের পল্লীতে হামলার ঘটনা ঘটে। হামলা থেকে বাঁচতে পল্লীর বাসিন্দা সূর্যি রাণী, তাঁর স্বামী ও মেয়ে নদে ঝাঁপ দিয়েছিলেন।

শরীয়তপুর জেলা শহরের ধানুকা মনসা বাড়ির মন্দিরটি ৫ আগস্ট দুই তিন ঘন্টা ধরে ভাঙচুর চলে। মন্দির কমিটির সাধারণ সম্পাদক গোবিন্দ চক্রবর্তীর বাড়ি ভাঙচুরের জন্য হামলাকারীরা চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। পরে সেনাসদস্যরা তাঁদের উদ্ধার করেন।

গত ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে খাগড়াছড়ি ও পরে রাঙামাটিতে পাহাড়ি বাঙালি সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। দীঘিনালা উপজেলায় একটি মোটরসাইকেল চুরিকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের সূত্রপাত। পাহাড় দুতিনদিন ধরে জ্বলছে। সংঘর্ষে ৪ জন নিহত ও ১০২টি দোকান আগুনে পুড়ে গেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সরকার ১৪৪ ধারা জারি করেছে । সেনা, পুলিশ ও বিজিবির টহল জোরদার করা হয়েছে।

বস্তুত ওখানে সেটেলাররা নানা অপরাধ কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ে। পাহাড়িরা সেই তুলনায় শান্ত এবং তাদের সততা আছে। সেটেলারদের পাহাড়ে নিয়ে যাওয়া ছিল জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। পাকিস্তান আমল থেকে স্বাধীন বাংলাদেশে পাহাড়ে নানা বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। ফলে পাহাড়ে অশান্তি বিরাজ করছে। দুই দশকেও পার্বত্যচুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ায় আদবাসীদের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশা বাড়ছে দিন দিন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, সুযোগ পেলে বাংলাদেশে দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার চলে, তাঁদের সম্পদ কেড়ে নেওয়া হয়। এবার একটি ইতিবাচক দিকও দেখা গেছে। অনেকে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দিতে এগিয়ে গেছেন। এই ইতিবাচক দিকটিকে উৎসাহিত করতে হবে। নতুন বাংলাদেশ গড়তে হলে কোনো ভেদাভেদ না করে সবার সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

ড. মুহাম্মদ ইউনুস ১৩ আগস্ট বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদসহ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সংগঠনের ৪০ জন প্রতিনিধির সঙ্গে বৈঠক করেন। ওই দিন তিনি ঢাকেশ্বরী মন্দির পরিদর্শনেও যান। সেখানে তিনি বলেন, এমন বাংলাদেশ আমরা গড়তে চাচ্ছি, যেটা একটা পরিবার এবং এই পরিবারের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা, বিভেদ করার প্রশ্নই আসে না। আমরা বাংলাদেশের মানুষ, বাংলাদেশি।

কিন্তু ওনার বক্তব্যের সাথে বাস্তবতার কোনো মিল পাওয়া যাচ্ছে না। প্রায় প্রতিদিনই দেশের কোথাও না কোথাও সংখ্যালঘুর ওপর হামলা ও নির্যাতনের খবর আসছে।

সংখ্যালঘুদের প্রতিবাদ-আন্দোলন

সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনে এবার তা৭রা জেগে ওঠেছে। কঠিন বৈরী পরিবেশেও তাঁরা ব্যপক সমাবেশ করেছে, মিছিল করেছে যা আগে কখনো দেখা যায়নি। দেশের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু সম্প্রদায়ের ঘরবাড়িতে হামলা, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, মন্দিরের মূর্তি ভাঙচুর ও চাঁদাবাজির প্রতিবাদে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে। সবচেয়ে বড় সমাবেশ করেছে চিটাগং ও ঢাকাতে। ঢাকার শাহবাগে নির্যাতন

বন্ধসহ আট দফা দাবীতে বিক্ষোভ করেছে সনাতনীরা। গত ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ এ বিক্ষোভে সনাতনী অধিকার আন্দোলনের ব্যানারে অংশ নেয় বাংলাদেশ হিন্দু পরিষদ, বাংলাদেশ হিন্দু জাগরণ মঞ্চ, সনাতন অধিকার মঞ্চ, ভক্তসংঘ সোসাইটি বাংলাদেশ, সনাতনী সচেতন ছাত্রসমাজসহ বিভিন্ন সংগঠন। এ ছাড়া 'সাধারণ শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়'-এর ব্যানারেও অনেক শিক্ষার্থী বিক্ষোভে অংশ নেন। বিক্ষোভকারীদের হাতে ছিল জাতীয় পতাকা ও প্ল্যাকার্ড। কেউ কেউ মাথায় বেঁধেছিলেন লাল-সবুজের পতাকা। আমার মাটি আমার মা, বাংলাদেশ আমি ছাড়বো না; আমি কে তুমি কে, বাঙালি বাঙালি; আমার ঘরে হামলা কেন, জবাব চাই জবাব দাও; কথায় কথায় বাংলা ছাড়, বাংলা কি তোর বাপ-দাদার?; ইত্যাদি নানা শ্লোগানে মুখরিত করে তুলে পুরো শহর।

সমাবেশে তাঁদের দাবী ছিল, গত ৫ আগষ্ট থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে, এসব ঘটনায় যারা দায়ী, তাদেরকে শনাক্ত করে দ্রুত বিচারের আওতায় আনতে হবে। বিক্ষোভের এ কর্মসূচী থেকে আট দফা দাবী জানানো হয় অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে।

১. সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন

২. জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন ও সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন

৩. অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পন আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন

৪. জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে জনপ্রতিনিধিত্বশীল সব সংস্থায় সংখ্যালঘুর অংশীদারিত্ব প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা

৫. দেবোত্তর সম্পত্তি পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন

৬. সংখ্যালঘুর ওপর হামলার ঘটনাগুলোর দ্রুত বিচারের জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠন

৭. ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা

৮. শারদীয় দুর্গাপূজায় ছুটি পাঁচদিন করা।

এ ছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন এবং তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইনের যথাযথভাবে কার্যকর করার দাবীও আছে। রাঙামাটি ও খাগড়াছড়িতে সংঘাত-সংহিসতার প্রতিবাদে ঢাকা, চট্টগ্রাম, বান্দরবনসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ হয়েছে।

এর আগেও সনাতনীরা আন্দোলন করেছেন। তখন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতিশ্রুতির কারণে আন্দোলন স্থগিত করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার, নিপীড়ন চলার কারণে আবার তাঁরা মাঠে নামেন। বিভিন্ন জায়গায় তাঁরা মন্দিরে পাহারা দিয়ে যাচ্ছেন।

সরকার আসে সরকার যায়, কিন্তু ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর ওপর নির্যাতন-নিস্পেষণ বন্ধ হয় না। সাম্প্রদায়িক সংহিসতার একটি ঘটনায়ও কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি, বিচার করা হয়নি। দেশে দায়মুক্তির সংস্কৃতি অব্যাহত থাকায় সঠিক বিচার পায় না। এভাবে বিচারহীনতা থেকে বাড়ে হতাশা, ক্ষোভ। এমনটি হলে সংখ্যালঘুরা প্রতিকারের জন্য কোথায় যাবে? বাধ্য হয়েই তাঁদের মাঠে নামতে হয়।

শেষ কথা

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি জনযুদ্ধ। সে যুদ্ধে বাংলার নর-নারী, সামরিক বাহিনী, হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রীস্টানসহ সকল ধর্মের লোক অংশ গ্রহণ করেছিল। বাঙালি, আদিবাসী সকল শ্রেণির মানুষ সর্বাত্মক এই যুদ্ধে শামিল হয়েছিল সমানভাবে। আমাদের জাতীয়তাবাদ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছিল একটি অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠন করা। অথচ আজ এ দেশের আশাহত সংখ্যালঘুরা প্রতিদিনই নিরুদ্দেশ হচ্ছে। কি নীরব প্রতিবাদ! ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হলে এরাই শরণার্থীর বেশ ছেড়ে বিনা

বাক্য ব্যয়ে ভারত থেকে মাতৃভূমিতে ফিরে এসেছিল। সম্প্রীতি ছিল অভূতপূর্ব। ফিরেছিল উল্লাস করে প্রকাশ্যে ও দলে দলে। এখন নিরুদ্দেশ হচ্ছে একা রাতের অন্ধকারে। যেন এ যাত্রার কোনো শেষ নেই। অথচ মাঝখানে তার কত স্মৃতি, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি। সংখ্যালঘুকে এই স্মৃতিটুকুন বড় বেশী ক্লান্ত করে। ১৯৪৭ এ দেশভাগ হয়েছিল ধর্মের ভিত্তিতে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক হিন্দুই তা মেনে নেয়। বিপরীতে ১৯৭১ ছিল ভাষাভিত্তিক মুক্তিযুদ্ধ। এই মুক্তিযুদ্ধ তাদেরকে বাঁচার আশা দিয়েছিল, দিয়েছিল সমানাধিকারের সুযোগ। '৪৭ ও '৭১ এর মধ্যে এই হচ্ছে তফাৎ। এই তফাৎটুকুর স্বাদ না থাকলে নিরুদ্দেশ হতে তাদের কোনো দ্বিধা থাকত না। আজ তাদের সামনে দুটো বাস্তবতা। রাষ্ট্রধর্মের দেশে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হয়ে থাকা নতুবা নিরুদ্দেশ হয়ে রাষ্ট্রবিহীন জনগোষ্ঠী হওয়া। যদি তাই হয় তাহলে এত সংগ্রাম, এত আন্দোলন ও আত্মত্যাগের মূল্য কি? বাংলাদেশে যারা সংখ্যালঘু, বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়, বিরাট এক বিভ্রান্তির মধ্য দিয়ে জীবনপ্রবাহ করে চলেছে। যখন সংখ্যালঘুরা বোঝে, সরকার তার পাশে নেই, তখন সে অসহায় বোধ করে । তাদের দাবী কেবল একটাই, পরাধীন আমলে যা হবে, স্বাধীন আমলে কেন তা প্রবাহিত হবে। স্বাধীন, পরাধীনের পার্থক্য যদি না থাকে, তবে স্বাধীনতার জন্য মানুষের জীবন বাজী রাখা কেন?

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে সংখ্যালঘুরা চরম মূল্য পরিশোধ করেছিল সর্বাধিক সংখ্যক শরণার্থী হয়ে ও অধিক রক্তমূল্য দিয়ে। ভারতে আশ্রয় নেয়া প্রায় এক কোটি শরণার্থীর মধ্যে প্রায় ৮০ লক্ষই ছিল হিন্দু শরনার্থী। কাজেই যুদ্ধের বিভীষিকা সংখ্যালঘুদের ওপর দিয়ে কীরকম বয়ে গেছে তা সহজেই অনুমেয়। দেশের নানা জায়গায় স্মৃতিস্তম্ভগুলোতে হিন্দুদের নাম সহজেই চোখে পড়ে। সেখানে তারা সংখ্যালঘু নয়।

একাত্তরে পাকিস্তানি সৈন্যরা হিন্দুদের ঘরবাড়িগুলি জ্বালিয়ে দিয়েছিল চরম হিংস্রতা নিয়ে। রাজাকাররা চিনিয়ে চিনিয়ে নিয়ে গেছে হিন্দুপাড়াগুলোতে। প্রথমে লুটপাট ও পরে ঘরগুলির দরজায় হলুদ রঙে 'ঔ মার্ক করে রেখেছে। পাকসেনারা পরে চিহ্নিত ঘরবাড়িগুলি পুড়িয়ে দিয়েছে। এই কৌশলটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইহুদীদের বিরুদ্ধে হিটলারের নাৎসী বাহিনী প্রয়োগ করেছিল। মা-বোনদের ধরে পাকসেনাদের ক্যাম্পে পৌঁছে দিয়েছে স্বাধীনতা বিরোধীরা। যৌথভাবে সারা বাংলাদেশ চষে বেড়িয়েছে। এলাকা ঘেরাও করে করে সার দিয়ে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মেরেছে পাখির মত করে। হিন্দু পরিচয় জানতে তার পরিধেয় খুলে নিশ্চিত করেছে।

পাকিস্তানিদের লক্ষ্যই ছিল পূর্ব বাংলা থেকে হিন্দুদের বিতাড়ন ও হিন্দুশূণ্য করা। শরনার্থী জীবনের দুর্দশার চিত্র আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম প্রকাশিত হতে শুরু করলে পাকিস্তানদের জন্য তা বুমেরাং হয়েছিল। এক সময় হেনরি কিসিঞ্জার নাকি বলেছিলেন, ইয়াহিয়া একটা মূর্খের মতো ভুল করলো হিন্দুদের তাড়িয়ে দিয়ে।

নয়টি মাস যুদ্ধে বিশিষ্ট হিন্দু ব্যক্তিবর্গকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। যুদ্ধের শেষ সময়ে এসে বুদ্ধিজীবীদের হত্যার সাথে তুলনীয় তা। দানবীর রনদা প্রসাদ সাহা (৭ মে'৭১), কুন্ডেশ্বরী ঔষধালয়ের কর্ণধার রাউজানের নূতন চন্দ্র সিংহ (২৩ এপ্রিল'৭১), আয়ুর্বেদ শাস্ত্রী এবং সাধনা ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠানের যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা (৩০ মার্চ'৭১), অধ্যাপক ও দার্শনিক গোবিন্দচন্দ্র দেব (২৬ মার্চ'৭১), অধ্যাপক সন্তোষচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৪ ডিসে.'৭১) প্রমুখরা তখন হত্যাকান্ডের শিকার হয়েছিলেন। পাকসেনারা প্রখ্যাত আইনবিদ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ধীরেনেন্দ্রনাথ দত্তকে নির্মমভাবে হত্যা করে (১৪ এপ্রিল'৭১। প্রথমে তাঁর হাটু ভেঙে দেয় এবং চোখ উপড়ে ফেলে। পরে গুলি করে হত্যা করা হয়। তাঁর অপরাধ ছিল বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রথম দাবী তোলেন পাকিস্তান গণপরিষদে। সম্প্রতি প্রয়াত রমা চৌধুরী নিগৃহীত হয়েছিলেন পাকসেনাদের হাতে। চট্টগ্রামের এই বিদূষী মহিলা একজন লেখিকা ছিলেন। প্রবন্ধ, উপন্যাস ও কবিতা মিলিয়ে তিনি ১৮টি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। কারো কোনো দান-অনুদান গ্রহণ না করে নিজের লেখা বই ফেরি করে জীবিকা চালাতেন। যুদ্ধের পর থেকে খালি পায়ে হেটেছেন, জুতো না পরে। কারণ তাঁর তিনটি সন্তানকেই মাটিচাপা দিতে হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধে মেজর জেনারেল চিত্ত রঞ্জন দত্ত (সি আর দত্ত), বীর উত্তম একজন সেক্টর কমান্ডার ছিলেন। তিনি ৪নং সেক্টরের দায়িত্বে ছিলেন। হবিগঞ্জের সন্তান তিনি। হবিগঞ্জের আরেক কৃতিসন্তান মুক্তিযোদ্ধা জগৎজ্যোতি দাস। যুদ্ধে অনন্য বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য একাত্তরে ১৬ নভেম্বর শহীদ হবার পর অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে বীরশ্রেষ্ঠ খেতাব প্রদানের ঘোষনা দেয়া হয়েছিল। ঘোষনা দিয়েও পরে কেন মরনোত্তর সর্বোচ্চ খেতাব প্রদান করা হলো না, তা আজও অজ্ঞাতই রয়ে গেল। পরে তাঁকে বীরবিক্রম খেতাবে ভূষিত করা হয়। নীলমনি সরকার, তিনিও একজন বীরবিক্রম মুক্তিযোদ্ধা। আমাদের জাতীয় পতকার ডিজাইনার শিব নারায়ন দাস। কিন্তু মানুষ জানে পটুয়া কামরুল হাসানের নাম। কারণ তিনি পতাকা থেকে বাংলাদেশের মানচিত্রটি তুলে দিয়ে পরিবর্তন এনেছিলেন। 'এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা, 'পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে, রক্ত লাল রক্ত লাল' অথবা 'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি'- ১৯৭১ এ এই গানগুলো প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধার কানে, প্রতিটি মুক্তিকামী বাঙালির কানে বাজতো। এ গানগুলোর শক্তি তখন কতটুকু ছিল তা বোঝানো কঠিন! এখনো শুনলে গায়ে কাটা দেয়। গানগুলোর রচয়িতা গবিন্দ হালদার। ২০১৫ তে তিনি মারা যান।

মুক্তিযুদ্ধে হিন্দুদের দুরাবস্থা ছিল অপরিসীম এবং অবর্ণনীয় তা। তবু আপসোসের সঙ্গে বলতে হয়, দেশ স্বাধীন হবার পর কোনো দিক থেকে তা স্বীকার করা হয় না। অনেকটা এড়িয়ে যাওয়া হয়। কোনো মিডিয়া, বিশিষ্টজন মুক্তিযুদ্ধে হিন্দুদের অবদান নিয়ে কিছু বলেন না। মুক্তিযুদ্ধে হিন্দু ধর্মালম্বীদের জীবন ও সম্পদের বলিদান ছিল সবচেয়ে বেশি, নির্যাতিত হিন্দু নারীদের সংখ্যাই বেশি। সারাদেশের এমন কোনো মঠ-মন্দির ছিল না, যা পাক হানাদার বাহিনীর হাতে ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি। কিন্তু ইতিহাসে তা লেখা হয় না। দেশিয় এবং আন্তর্জাতিকভাবেও তার মূল্যায়ন নেই। পিছে এ যুদ্ধ পাকিস্তানের অভ্যন্তরীন দ্বন্দ্ব কিংবা সম্প্রদায়গত বিরোধ হিসেবে আখ্যা পায়। বাংলাদেশে যখন প্রতিদিন নিয়ম করে হিন্দু নিধন চলছিল, তখন আশ্চর্যজনকভাবে ইন্দিরা গান্ধির কংগ্রেস সরকার তার গুরুত্ব প্রকাশে রাজি ছিল না। কারণ, তখনকার বিরোধী দল ভারতীয় জনসংঘ (যা আজকের ভারতীয় জনতা পার্টি বা বিজেপি) এ নিয়ে রাজনীতি করুক, তা তিনি চাননি।

শেষ কথা, স্বাধীনতা যুদ্ধে হিন্দুদের অবদান সঠিক মূল্যায়ন আজও হয়নি। কিন্তু এটা হওয়া উচিৎ। আদিবাসীদের কী অবদান, নানা প্রান্তিক জনগগাষ্ঠীর কী অবদান, তার গবেষণা ও মূল্যায়ন হওয়া উচিত দেশের স্বার্থে, ইতিহাসের স্বার্থে। কারোরই আত্মত্যাগকে খাটো করে দেখার উপায় নেই। ভবিষ্যত প্রজন্ম যেন সঠিক ইতিহাস জানতে পারে। ৭১ এ মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে পাকিস্তানে পাঠ্যবইগুলোতে ভুল ইতিহাস পড়ানো হয়। তাদের কিশোররা ভুল ইতিহাস শিখছে। এভাবে কোনো জাতি দৈন্যতা কাটিয়ে উঠতে পারে না। ৭১ সম্পর্কে প্রতিটি পাকিস্তানি একেকজন ইয়াহিয়া। তারা ইয়াহিয়া, টিক্কা খান, নিয়াজির নকল বীরত্বের বন্দনা শিখছে। আমাদেরও সঠিক ইতিহাস দরকার। নইলে স্বাধীনতার সুফল অবৈধ দাবিদার, বিরোধীতকারী ও স্বার্থান্বেষী ভোগীদারদের হাতে চলে যাবে এবং সে অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের ইতিমধ্যে যথেষ্টই হয়েছে বলে মনে করি '৭৫ এর পট পরিবর্তনের পর থেকে। আর দুর্ভাগ্যজনকভাবে এ দেশের দেশপ্রেমিকদের বারে বারে পরীক্ষা দিতে হবে যারা দেশটির স্বাধীনতা চায়নি, বিরোধীতা করেছে বা আজও মন থেকে বাংলাদেশকে মেনে নিতে পারেনি তাদের কাছে।

বস্তুত পরীক্ষা দেয়া, মূল্য দেয়া হিন্দুদের কখনো বন্ধ হয়নি। আজও তা চলমান।

১৯৯০ সালে সামরিক শাসক এরশাদ সরকারের ক্ষমতা নড়বড়ে হওয়ার মূল্যও দিয়েছে হিন্দুরা। তখন সামরিক শাসন থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণ ঘটে। ১৯৯০-৯২ সালে বাবরী মসজিদ প্রথমে ভাঙার চেষ্টা এবং পরে ভাঙার মূল্য দিয়েছে বাংলাদেশের হিন্দুরা। ২০০১ সালের নির্বাচণে তাদের মূল্য দিতে হয়েছে। তাদের ঘরবাড়ি পোড়ানো হয়েছে, দেশ ছাড়া করা হয়েছে, শত শত নারী ধর্ষিতা হয়েছে। গণতন্ত্রের

ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে কোনো নির্বাচন এলে এ দেশের সংখ্যালঘুদের কম-বেশী মূল্য এখনো পরিশোধ করতে হয়। সেই ২০১২ সাল থেকে ফি-বছর ফেসবুকে ধর্ম অবমাননার উস্কানীমূলক পোস্টিং দিয়ে হামলা চালানো একটি প্রথায় পরিণত হয়েছে। সংখ্যালঘুরা যেন তার প্রাপ্য সম্মান ও স্বীকৃতিটুকুন পাবার অধিকার হারাতে বসেছে। অথচ যেকোনো দেশের সংখ্যালঘুদের অবস্থা দেখে দেশটির গণতন্ত্রের গভীরতা মূল্যায়ন করা হয়।

আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসের একটি অনুষ্ঠানে লেখক ও কলামিস্ট সৈয়দ আবুল মকসুদ একবার বলেছিলেন, বাংলাদেশের দুই শ্রেণির মানুষ দেশত্যাগ করে। এক শ্রেণি হলো মন্ত্রী-এমপি ও বড় আমলাদের ছেলেমেয়েরা। তারা উড়োজাহাজে করে যায়, ওঠে তাদের দ্বিতীয় হোমে। আরেক শ্রেণি হলো ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষেরা। তারা দেশত্যাগ করে পায়ে হেঁটে।

পৃথিবীর অনেক দেশের লোকসংখ্যা এক কোটিরও কম। এ দেশে তার চেয়ে বেশি সংখ্যক হিন্দু আছে। তাঁরা নিজেদের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হোক, মনোযোগী হোক। তাঁরা ঘুরে দাঁড়াক নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায়। প্রতিজ্ঞা করুক, আজ থেকে আর একটি পরিবারও ভারতে যাবে না। এভাবে চলে যাবার মানসিকতা ছেড়ে অধিকার আদায়ে যত্নবান হোক। মাতৃভূমির টানেই তাঁরা নিজ মাটিতে থাকবে। সে ক্ষেত্রে সংখ্যাগুরুদের দায়িত্বও গুরুত্বপূর্ণ। সংখ্যাগরিষ্ঠদের স্বীকার করে নিতে হবে সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব, পাশাপশি সংখ্যালঘুদের সংখ্যালঘুত্ব মানসিকতা থেকেও বেরিয়ে আসতে হবে।

এ উপমহাদেশ যদি ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার পরিবর্তে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও জাতীয়তাবাদে একনিষ্ঠ হতো তাহলে এ ভূখন্ড উদ্ভাবনী শক্তিতে পৃথিবীর প্রথম সারিতে অবস্থান করতে পারত, যেখানে রয়েছে হাল আমলে ক্রমানুসারে দক্ষিণ কোরিয়া, সুইডেন, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, জাপান, ডেনমার্ক, আমেরিকা ও ইসরায়েলসহ ৫০ টি দেশ। অথচ এ উপমহাদেশের একটি দেশও সেখানে নেই। এর কারণ সহজেই অনুমেয়। বিরাট সংখ্যক মানুষের মেধার ব্যবহার নেই যুগ যুগ ধরে, বরং অপচয়ই হয়েছে ভুল রাজনীতির পথে ও ধর্মের নামে। প্রায় ৮০০ কোটি মানুষের পৃথিবীতে মাত্র দেড়কোটিরও কম ইহুদীরা। কিন্তু এক চতুর্থাংশের কাছাকাছি নোবেল পুরস্কার অর্জন করেছে। নোবেল পুরস্কার তো কেবল একটি পুরস্কার নয়; একটি আবিষ্কার, যার মধ্য দিয়ে পৃথিবীকে এগিয়ে নেওয়ার মহৎ প্রচেষ্টা ও কর্মসাধনা থাকে।

কাজেই সাম্প্রদায়িক স্বার্থ পরিত্যাগ করে সকলে জাতীয়তাবাদী হবে, বিজ্ঞানমনস্ক হবে, এর চেয়ে একটি দেশের জন্য ভালো কিছু হতে পারে না।

৫-২০ আগস্ট ২০২৪ : হামলার শিকার সংখ্যালঘুদের ঘরবাড়ি ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১০৬৮

[দেশে গত ৫ আগস্ট রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর হিন্দু সম্প্রদায়সহ সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। আবার এসব হামলাকে কেন্দ্র করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও ভারতীয় মূলধারার কিছু গণমাধ্যমে অনেক অপতথ্যও ছড়ানো হয়েছে। বহু মৃত্যুর সংখ্যা বলা হয়েছে। সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা নিয়ে প্রথম আলোতে শুরু থেকেই বেশ কিছু প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। তা ছিল ঘটনাভিত্তিক, সার্বিক চিত্র নয়। এ কারণে দেশব্যাপী অনুসন্ধান করে সঠিক তথ্য জানা প্রয়োজন। সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার তথ্য সংগ্রহ করা হয় ৫ থেকে ২০ আগস্ট পর্যন্ত। সংগৃহীত তথ্য পুনরায় যাচাই, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রস্তুতের মধ্যে বিভিন্ন জেলায় শুরু হয় বন্যা। তবে এখনো দেশে ও বিদেশে এসব নিয়ে আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক হচ্ছে। এমন প্রেক্ষাপটে বিলম্ব হলেও বিভিন্ন জেলায় সংখ্যালঘুদের ওপর সাম্প্রতিক হামলার একটি চিত্র পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হলো।]

হামলার শিকার সংখ্যালঘুদের স্থাপনা (৫-২০ আগস্ট ২০২৪)

বিভাগওয়ারি হিসাব

	ঢাকা	চট্টগ্রাম	রাজশাহী	খুলনা	বরিশাল	রংপুর	সিলেট	ময়মনসিংহ
ঘরবাড়ি ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান	৭৮	৪৫	১৫৫	২৯৫	৬৮	২১৯	২৫	১৮৩
উপাসনালয়	১	০	৩	৫	২	৯	০	২

জেলাওয়ারি হিসাব

■ ঘরবাড়ি ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান
■ উপাসনালয়

			নওগাঁ	২৪	১	বরিশাল	১০	০	ঢাকা জেলার ৭ থানা	১০	০
			রাজশাহী	৪৫	১	পটুয়াখালী	৭	১	নোয়াখালী	৭	০
পঞ্চগড়	৩০	০	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৯	০	বরগুনা	৩১	০	চট্টগ্রাম	২৬	০
ঠাকুরগাঁও	৭৮	৭	কুষ্টিয়া	১০	০	পিরোজপুর	১৬	১	খাগড়াছড়ি	৮	০
দিনাজপুর	১৮	১	ঝিনাইদহ	১৩	০	ঝালকাঠি	৪	০	কুমিল্লা	১	০
নীলফামারী	১৬	১	মেহেরপুর	৩	০	ফরিদপুর	১০	১	চাঁদপুর	৩	০
লালমনিরহাট	৫৬	০	চুয়াডাঙ্গা	২	০	রাজবাড়ী	১০	০	মৌলভীবাজার	১৬	০
গাইবান্ধা	২১	০	যশোর	৬৩	৫	টাঙ্গাইল	১০	০	সিলেট	৯	০
জয়পুরহাট	১২	০	মাগুরা	২৪	০	কিশোরগঞ্জ	৩	০	নেত্রকোনা	৮৭	০
বগুড়া	৩৬	০	সাতক্ষীরা	৭৩	০	মানিকগঞ্জ	৬	০	জামালপুর	৩	০
সিরাজগঞ্জ	১৬	০	খুলনা	৭৪	০	মুন্সিগঞ্জ	৩	০	শেরপুর	৮	০
নাটোর	৬	১	বাগেরহাট	২৩	০	নরসিংদী	২০	০	ময়মনসিংহ	৮৫	২
পাবনা	৭	০	নড়াইল	১০	০	নারায়ণগঞ্জ	৬	০	মোট	১,০৬৮	২২

ছবি:

রংপুর টিটোর বৃদ্ধা মা (দুটি ছবি)

নাসিরনগরে রসরাজ দাস (সহ চারটি ছবি)

রামু বৌদ্ধ মন্দির (সংস্কারের পর)

হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টার ঐক্য পরিষদের সম্মেলন, সোহরাওয়ার্দি উদ্যান

Sweety

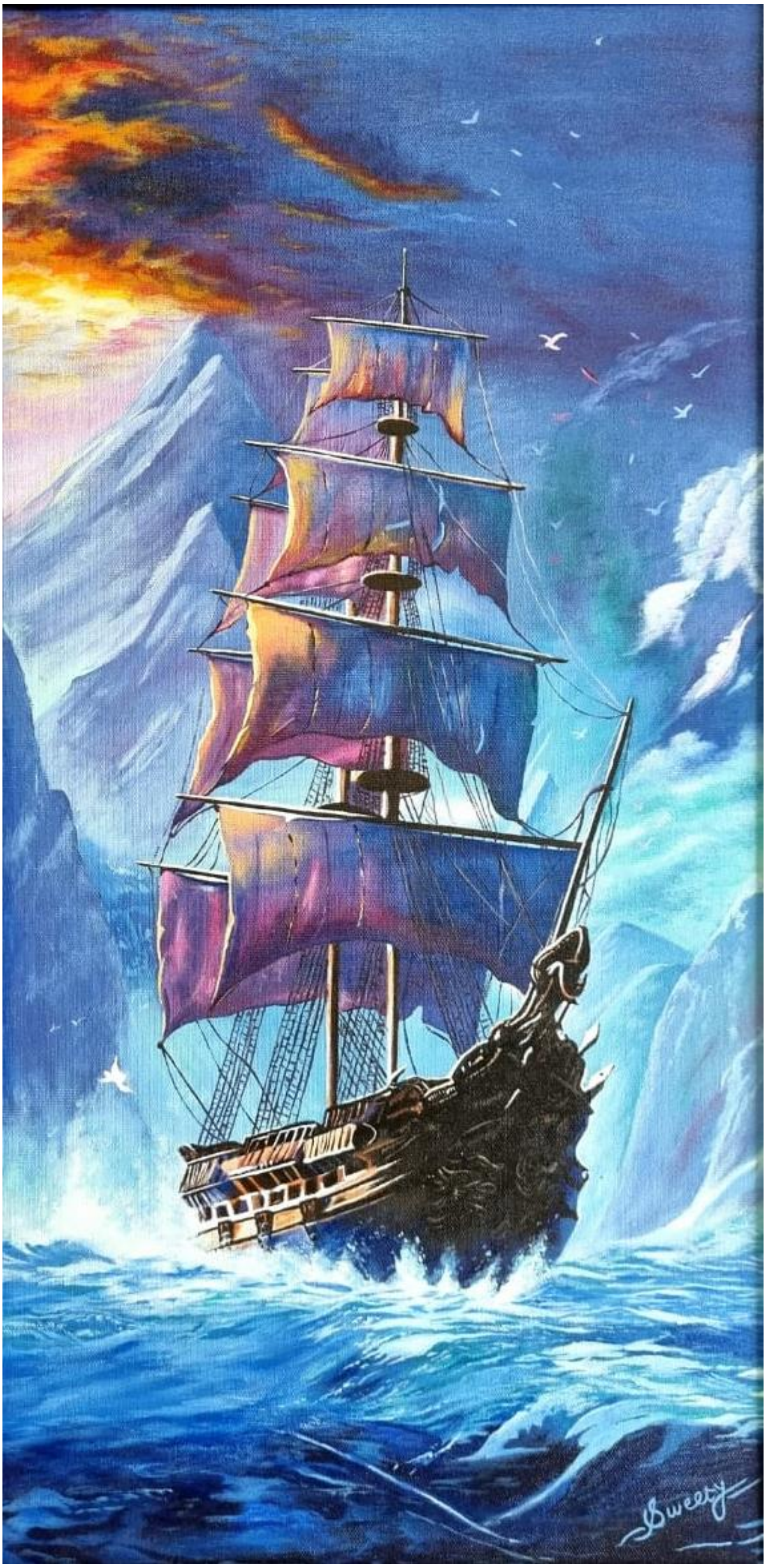

Sweety

Sweety

Sponsored by

AK TRADE HOUSE

AK EXPORT & IMPORT AB

Sponsored by

SIGTUNA
HÄLSOKOST

SPC GROUP AB

Stora Gatan 54, 19930 Sigtuna
08-592 517 85
info@sigtunahalsokost.se

STOCKHOLM SARBOJONIN PUJA COMMITTEE

© Copyright Likhon 2024

লিখন ১৪৩১

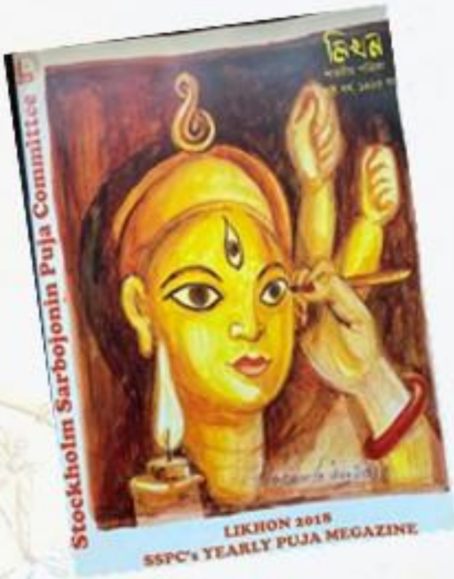

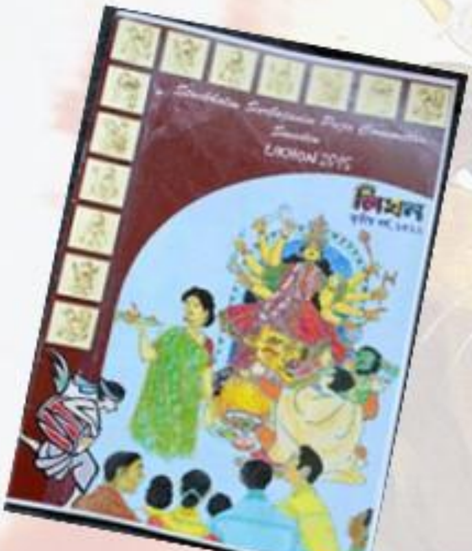

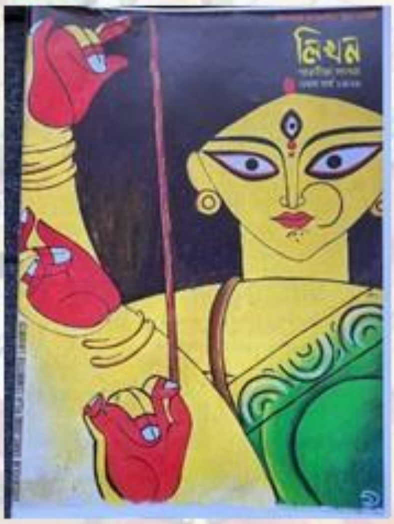

এক ডজন লিখন